জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১০

নাজি নাগপাশে ভদ্রবিৎত ১পর্ব

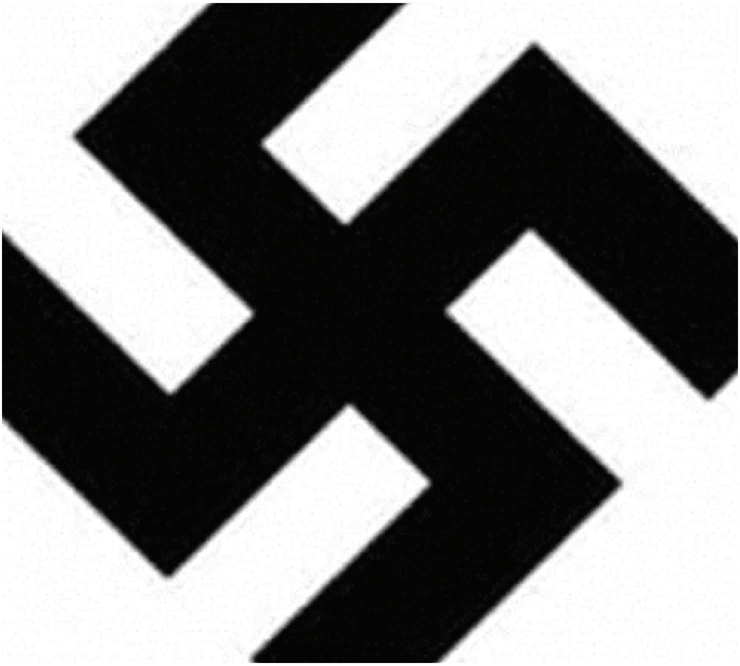

হিটলারি উপনিবেশিকতা ও নৃতাত্ত্বিক ফ্যাসিবাদ

জ্ঞানগঞ্জ

উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১০

নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত - হিটলারি উপনিবেশিকতা ও নৃতাত্ত্বিক ফ্যাসিবাদ, প্রথম পর্ব

Nazi Nagpashe Vodrobitto - Hitlari UponibeSikota O Nritattwik Fyasibad, 1st Part

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বহ্নিহোত্রী হাজরা, শমিত সান্যাল, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ১০০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

'এরই আয়োজনে অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে,একাধিক বিপ্লবে ;
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে!'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে জাতীয়তাবাদীরা ইউরোপের বেশিরভাগ অংশে ক্ষমতায় এসেছিল তারা ইতিহাস-নির্মাণে গভীরভাবে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ঘটিয়েছিল। জাতিবাদ হয়ে উঠেছিল তাদের রাজনীতির 'আলফা'সত্তা, তার নেতা এবং প্রহরীরা বর্তমানকে একটি গৌরবময় অতীতের সাথে মেলাতে চাইতো। বেনিটো মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী ইতালি (১৯২২-৪৩/৪৫) প্রাচীন রোম থেকে সরাসরি তার প্রতীক এবং স্বপ্নচিহ্ন আহরণ করে, সরকারী চিহ্ন হিসাবে বান্ডিল বা 'ফ্যাসেস'কে গ্রহণ করে, আফ্রিকান অঞ্চলগুলিকে একটি পুনরুদ্ধার করা সাম্রাজ্য হিসাবে চিত্রিত করে। তবে তাদের কেউই জার্মানির ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের মতো হিংস্রতার সাথে মানুষের প্রাকইতিহাস, জন্মবিবরণের ঠিকুজি-কুলুজি সম্পর্কে মোহাচ্ছন্ন ছিল না। এর মূলে কাজ করেছিল জাতিতত্ত্বের অযৌক্তিকতা, কারণ শীর্ষে অ্যাডলফ হিটলার থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসক, সাংবাদিক এবং হিটলারের-ইয়ুথ বাহিনীর নেতাদের কাছে, সকল নাৎসি মতাদর্শীর কাছে জার্মান এবং ইউরোপীয় প্রাগৈতিহাসের প্রতিটি কল্পিত মুহূর্ত ছিল আঁকড়ে ধরার, তা সত্য হোক বা কল্পনার। নাৎসি বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতপক্ষে তাদের বিশেষ 'জাতির' ধারণা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যপকভাবে বৈচিত্র্যময়; ফলস্বরূপ, তারা সামগ্রিকভাবে ধারণা দ্যান যে তারা প্রায় নির্বিচারে সমগ্র জাতিগত উৎস ও বর্গবিভাজন কল্পনা করতে পেরেছেন। কঠোর একনায়কতান্ত্রিক শাসন ও 'অপর'কে হত্যার ন্যায্যতা হিসেবে কোনো শাসনব্যবস্থাই এতটা জোরালোভাবে মনুষ্য-উৎপত্তির তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেনি। অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো ব্রিটেনেও বর্ণবাদ ছিল রাষ্ট্রীয় অনুশীলন। এটি বিশেষত এর সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে ছিল - যেখানে উপনিবেশিতদের শ্রেণিবিন্যাস অবশ্যই একটি বিষয় ছিল। তবুও ১৯৩০-এর দশকে জার্মানিতে, মানুষের জাতিগত শুদ্ধতার প্রাক-ইতিহাস নিজেই রাষ্ট্রের বিষয় হয়ে ওঠে। নাৎসিরা এমনভাবে কাজ করেছিল যেন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ইউরোপ তথা বিশ্বের বুকে জামার্ন-আর্যরক্তের আধিপত্য স্থাপন করা। ১৯৪১-৪২ সালে জাতিগত প্রাগৈতিহাস ইউরোপের ইহুদিদের নির্মূল করার জন্য একটি যুক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

এটি কেবল একটি অস্পষ্ট অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি; এটি নাৎসি এজেন্ডাকে সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় আকার দিয়েছে। জাতিতত্ত্ব ছিল জাতীয়তাবাদী

সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম প্রধান ধ্যানজ্ঞান ও প্রিয়তম রাজনৈতিক 'বর্গ'। কিন্তু, এইখানেই থেমে গেলে জাতি সম্পর্কে নাৎসিদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল এবং তাদের জাতিগত ধারণাগুলি মানব-ইতিহাস নির্মাণের একটি বিশেষ ইউরোকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর কতটা নির্ভর করে তা বুঝতে ব্যর্থ হতে হবে।

নাৎসি চিন্তাবিদরা আধুনিকতার সরব সন্তান আইনি-কাঠামো ও শরীরী-নৃতত্ত্বকে এই কাজে ভরপুর ব্যবহার করেছিলেন। এই নৃতাত্ত্বিক-উপাত্ত এবং উদাহরণগুলি ইহুদি-বিরোধী ঘোষণাগুলির অযৌক্তিকতাকে বৈধতা দিয়েছে এবং বিশ্বের বুকে জাতীয়বাদী সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায্যতা দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, নাৎসিরা এ পর্যন্ত এই বিষয়ে যে বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই বইটিতে আমরা সেই সমস্ত ধারণা, ঘটনাবলী এবং চরিত্রের সম্মুখীন হয়েছি। তারা বেশিরভাগই বিখ্যাতজন। তথাপি, এই অনুসন্ধান জারী থাকবে বর্তমান পুঁথির দ্বিতীয় খন্ডে।

অত্রি ভট্টাচার্য

বিনয় কুমার সরকার এবং নাজি-বন্ধু বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ
উপনিবেশে ফ্যাসিবাদ

বৈজয়ন্তী রায়

নাজি নীতি প্রচারে কলকাতায় ১৯৩৩এ অর্থনীতিবিদ বিনয় কুমার সরকারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ, সঙ্গে ছিলেন ব্যবসায়ী নরেন্দ্র নাথ ল, বীরেণ দাশগুপ্ত। কার্যকাল ৬ বছর। সংসদ মূলত বক্তৃতা আয়োজন করত। নাজি প্রচারক ছাড়াও বহু প্রখ্যাত মানুষ এই সংগঠনে বক্তৃতা দিয়েছেন/ কলকাতার উচ্চকোটি সমাজের মানুষজন এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরের দিকে যোগ দেয় রামকৃষ্ণ মিশনও। জার্মানিতে জলপানি নিয়ে পড়তে যাওয়া ছাত্ররা কলকাতায় ফিরে সমিতির কাজে যোগ দিতেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের অভিযোগ বিনয় সরকার নাজি রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য পান। সংগঠনের সঙ্গে জুড়ে থাকা বক্তারা নাজি জাতিবাদী দর্শনের সঙ্গে 'প্রাচীন ভারতবর্ষের' নীতিমালার যোগ দেখতেন। বিনয় কুমার সরকার মনে করতেন হিটলার 'বিবেকানন্দের নৈতিক আদর্শবাদ এবং বিসমার্কের বজ্রকঠিন দৃঢ়তার মিলিত শক্তি'র প্রতিভূ। তিনি ভারতবর্ষের নাজিপক্ষীয় গোষ্ঠীর চর্চিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির উত্থানের সঙ্গে মিলিয়েছেন এবং নাজি সুপ্রজনবিদ্যা, নাজি অর্থনীতিকে স্পষ্টভাষায় মান্যতা দিয়েছেন। অসদস্য হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর; বক্তৃতা শুনতে আসতেন কংগ্রেসি রাজনীতিবিদ বিধান রায়, ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বোস, আর আহমেদ। বক্তৃতা আয়োজিত হল কলেজ স্কোয়ারের বুদ্ধিস্ট হলে, বুদ্ধিস্ট হল ছিল কলকাতার উচ্চকোটি নাজিপক্ষীয়দের মিলনস্থল।

জার্মান দেশে ন্যাশনাল সোসালিস্ট, কথ্য ভাষায় নাজি আন্দোলনের তুঙ্গ সময়ে উপনিবেশিক ভারতবর্ষে নাজি রাজনীতি, নাজি রাষ্ট্রের নীতিমালা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৩৩এ কলকাতায় বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ তৈরি করেন জার্মান-বান্ধব, বহুভাষিক পণ্ডিত, অর্থনীতিবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল 'আমাদের দেশবাসীর মধ্যে জার্মান প্রতিষ্ঠান, জার্মান বিজ্ঞান এবং জার্মান কলা বিদ্যা ইত্যাদি অধ্যয়ন এবং প্রচার।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ কলকাতায় জার্মান রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং নাজি রাজনীতি প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা আয়োজন করেছে।

কলকাতায় বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ তৈরির এক বছর আগে ১৯৩২এ আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে জার্মান প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত Otto Spies তৈরি করেন জার্মান সোসাইটি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান সোসাইটির সদস্য সাত্তার খেইরি (খেইরি ভাইদের কাজকর্ম জানতে M. H. Siddiqr Bluff, doubt and fear - The Kheiri brothers and the colonial state, 1904-45) জার্মান ভাষা পড়াতেন। জার্মান সোসাইটি নিয়ন্ত্রণ করত আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি। কলকাতার বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ ছিল স্বাধীন সংগঠন। সমিতি সমাজের নানান ক্ষেত্রের পেশাদার, অভিজাত বাঙালিকে নাজি জার্মানির কৃতি প্রচারে কাজে লাগিয়েছে।

উপনিবেশিক আমলের শেষের দিকে কলকাতার প্রথিতযশা অধ্যাপক

বিনয় কুমার ছিলেন সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে, জার্মান নাজি রাষ্ট্র তৈরির আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠার সময়ক্রমে কলকাতায় জার্মান নাজি দর্শন এবং জার্মান জাতীয়দাবাদ প্রচারের অন্যতম মুখ। বহু বছর ইওরোপে কাটানোর সূত্রে বিনয় সরকার নাজি নীতিমালার সঙ্গে পরিচিত হন। বিনয় সরকার মনে করতেন জার্মানির সমস্ত সমস্যার মূলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। হিটলারের উত্থান জার্মানির সমস্ত সমস্যার সমাধানের সূত্র। ভারতবর্ষের উচিৎ হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাজি দল গঠন করা। জার্মান বৌদ্ধিক পরম্পরা, ভারতের অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গে জুড়ে থাকা নাজি রাজনীতি নিয়ে তাঁর ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৩৪এ প্রকাশিত The Hitler State: A Political, Economic and Social Remaking of the German people বইতে। তিনি মন্তব্য করেছেন হিটলার ‘বিবেকানন্দের নৈতিক আদর্শবাদ এবং বিসমার্কের বজ্রকঠিন দৃঢ়তার মিলিত শক্তি’র প্রতিভূ। বিনয় কুমার ভারতবর্ষের নাজিপক্ষীয় গোষ্ঠীর চর্চিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির উত্থানের সঙ্গে মিলিয়েছেন। বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নাজি জার্মানির তাত্ত্বিকতাকে অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যেজুড়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উত্থানের কল্পময় কথন তৈরি করা।

ব্যক্তিত্বশালী বৌদ্ধিক পুরুষ বিনয় সরকারকে জাতীয়তাবাদী, নাজি তাত্ত্বিক কার্ল হাউসোফার (Karl Haushofer) জার্মানিতে পড়ানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিনয় সরকারের বই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করেছেন। হাউসোফারের উদ্যোগে ১৯২৮এ মিউনিখে ডয়েশ একাডেমির (Deutsche Akademie, ডিএ) শাখা হিসেবে ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষীয় ছাত্র গবেষকদের বৃত্তি দিয়ে ভারতবর্ষে জার্মান-স্বার্থ প্রচারে সামিল করা। বিনয় সরকারকে ১৯৩০-৩১এ মিউনিখের টেকনিক্যাল একাডেমিতে পাড়ানোর আমন্ত্রণ জানান হাউসোফার (বিনয় সরকারের বৈঠকের প্রথম খণ্ডে হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয়তে বিনয় সরকারের নাজি সংযোগ নিয়ে সম্পাদকের স্পষ্ট অবস্থান নেই। সম্পাদক নাজি সংযোগ স্পষ্টভাবে বলছেন তো না, বরং নাজি তাত্ত্বিক, হিটলারের জাতিবাদী, গণহত্যার রাজনীতি তৈরি করে দেওয়া হাউসোফারকে মহিমান্বিত করছেন। সম্পাদকীয়তে হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘...অধ্যাপক হাউসোফার বিনয়কুমারকে নিমন্ত্রণ করে নিজ বাড়িতে শোবার ঘরে নিয়ে যান। বিনয়কুমার প্রত্যক্ষ করেন সোনার জলে বাঁধানো ‘ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া’ গ্রন্থখানি হাউসোফারের শোবার ঘরে বিছানার শিয়রে একটা ছোট টেবলে সযত্নে নতুন বাইবেল (This is the new Bible of Young Germany)। জার্মাণ রাজনীতিতে হিটলারের পরিপূর্ণ

আবির্ভাব ঘটতে তখনও বছর দুই দেরী।' বিনয় সরকার যখন জার্মানিতে, সে সময় হিটলার, তার নাজি দল তড়পাচ্ছে - অথচ সম্পাদকের দাবি হিটলারের পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত হতে তখনও দু'বছর বাকি। ১৯৩৩এ তৈরি হবে সমাজতন্ত্রের নামে নাজি গণহত্যাকারী রাষ্ট্র। সলতে পাকানো শুরু হয়েছে তার অনেক আগেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাহানায়। তারা বলছেন বিনয় সরকারের 'ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া' নতুনভাবে গড়ে ওঠা জার্মানির তাত্ত্বিক ভিত্তি! মাথায় রাখুন হাউসোফার ছিলেন হিটলার আর হেসের রাজনীতির গুরু। ঐতিহাসিক হোলগার হারউইক 'দ্য ডেমন অব জিওপলিটিওক্স, হাউ কার্ল হাউসোফার এডুকেটেট হিটলার এন্ড হেস' বইতে লিখছেন, "Like a dry sponge, Hitler soaked up what Haushofer offered. ...Every Wednesday between 24 June and 12 December 1924, Prof. Dr. Haushofer made the 100-kilometer-long round trip from Munich to Landsberg. Once each morning and once each afternoon he offered what he called the "young eagles," Hess and Hitler, hours of intense personal mentoring.... "Bringing Haushofer and Hitler together," Joachim Fest, Hitler's most prolific biographer, observed, "is the most important . . . personal contribution that Rudolf Hess made to the creation and the face of National Socialism."। এছাড়া হোলগার হারউইক Office of US Chief of Counsel, September 1945, সূত্র তুলে বইএর ভূমিকার শুরুতে জানাচ্ছেন, Haushofer was Hitler's intellectual godfather. It was Haushofer, rather than Hess, who wrote Mein Kampf and who furnished the backbone for the Nazi bible and for what we call the criminal plan. . . . Really, Hitler was largely only a symbol and a rabble-rousing mouthpiece. The intellectual content of which he was the symbol was the doctrine of Haushofer.)।

১৯৩৩এর অক্টোবরে ডিএর পত্রিকা Mitteilungen (বার্তা) কলকাতায় জার্মানি এবং জার্মান বৌদ্ধিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরতে জার্মান সমিতি তৈরির পরিকল্পনা করে। পত্রিকার পক্ষে বলা হল, যে সব ছাত্র ডিএর জলপানি পেয়ে জার্মানিতে গবেষণা সমাপ্ত করেছে, তারাই হবে এই সমিতির পরামর্শদাতা। তবে তারা শুধু ছাত্রদের সদস্যপদ দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, পরের দিকে সমিতির সদস্য হিসেবে জুড়েনিয়েছেন বহু পুরোধা ব্যক্তিত্বকে। বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ তৈরি হওয়ার গায়ে গায়ে সময়েই Mitteilungen পত্রিকা বিনয় সরকারকে ভারতবর্ষের কৃষ্টি জগতে তাঁর বিপুল অর্জন আর কৃতিকে সম্মান জানিয়ে

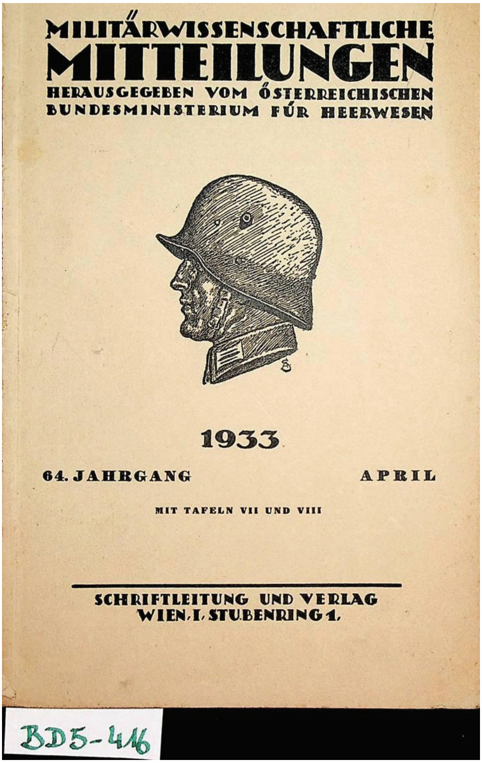

সংগঠনের সম্মানিত সদস্য মনোনোনীত করে। এরপর থেকে বিনয় সরকার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কার্যত ডিএ আর নাজিদের স্থায়ী মুখপাত্র হয়ে ওঠেন।

বিনয় সরকার হলেন সমিতির পথনির্দেশক; উদ্যোগপতি, দ্য ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লির সম্পাদক নরেন্দ্র নাথ ল' হলেন সংগঠনের সভাপতি। সহসভাপতিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরদারিতে থাকা ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোং‌এর মালিক বীরেন দাশগুপ্ত। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বার্লিনে থেকে জার্মানদের পক্ষে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালান। তারপর থেকেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নজরদারিতে ছিলেন। সমিতির অধিকাংশ বৈঠক আয়োজিত হত ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোং‌এর দপ্তরে। সমিতির বক্তৃতা আয়োজিত হত কলেজ স্কোয়ারের বুদ্ধিস্ট হলে।

১৯২৬এ লিপজিগে এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি নিয়ে গবেষণা করা সুহৃদ মিত্র, বিদ্যা সংসদের অন্যতম সদস্য। এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি নিয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন ১৯৩৩এর ২১ নভেম্বর বুদ্ধিস্ট হলে, অন্যটি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬এ Gestalt Theory in German Psychology বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বক্তৃতা শুনতে বুদ্ধিস্ট হলে উপস্থিত ছিলেন সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে চিঠি আদানপ্রদান করা মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বোস, কংগ্রেস নেতা, পরে মুখ্যমন্ত্রী, বিধান চন্দ্র রায়। ১৯৩৫এর ১৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবীর কান্ট এবং আধুনিক চিন্তা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ডিএর জলপানি নিয়ে মিউনিখে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া মৈত্রেয়ী বসু চ্যাটার্জী ছিলেন সমিতির অন্যতম পরামর্শদাতা। কলকাতার একটি মহিলা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সুষমা সেনগুপ্ত

এম এ’র নামও সমিতির সদস্য তালিকায় রয়েছে। ডিএর প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় ১৯৩৪এ বক্তৃতা দেন Horst Pohle। তাকে কলকাতায় বক্তৃতা দিতে নির্দেশ দেন ডিএর সম্পাদক Franz Thierfelder। ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনীর কঠোর নজরদারিতে থাকা Horst Pohle ছিলেন নাজি দলের সদস্য।

বিদ্যা সংসদের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল নাজি রাজনৈতিক কাঠামোর প্রচারক, তাত্ত্বিদের সঙ্গে নাজি সিম্প্যাথাইজারদের বক্তব্য প্রচারের মঞ্চ তৈরি করা। ১৯৩৩এর ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার জার্মান উপরাজদূত হার্বারট রিখটার বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘নতুন জার্মানি।’ প্রায় একই সময়ে একই বক্তৃতা ‘এলিমেন্টস অব নিউ জার্মানি’ বলেছেন বিশ্বভারতীতে। আর্য রক্তধারার শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বক্তৃতায় তুলে ধরে মন্তব্য করেন, আশাকরি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভারতবর্ষীয় বন্ধুরা বুঝবেন।

১৯৩৪এর ২৭ মার্চ সমিতির মঞ্চে বক্তৃতা করেন Horst Pohle এর পূর্বসূরী Heinz Nitzschke, Three German Sociologists: Ferdinand Tönnies, Hans Freyer and Leopold von Wiese বিষয়ে। মাথায় রাখতে হবে Freyer, von Wiese লেখাপত্রে নাজি রাজনীতির বৈধতা তৈরি করেছেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের সমীক্ষা থেকে জানতে পারি Nitzschke প্রায়শই নাজি জার্মানি বিষয়ে নানান জায়গায় বক্তৃতা দিতেন, কলকাতার ওয়াইএমসিএতে ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। তিনি কলকাতায় জার্মান ভাষা শেখাতেন।

জার্মানিতে ডিএ’র জলপানি নিয়ে গবেষণা করা বটকৃষ্ণ ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ভাষার অধ্যাপনা শুরু করেন। ২০ এপ্রিল, ১৯৩৪এ Recent German researches in Linguistics বিষয়ে সমিতির মঞ্চে বক্তৃতা দেন। যতদূরসম্ভব বটকৃষ্ণ সমিতির ছাত্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের ধারণা বটকৃষ্ণ ছাড়াও কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে ডেন্টাল কলেজের প্রধান আর আহমেদ এবং যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক বাণেশ্বর দত্ত অক্ষশক্তি পক্ষাবলম্বী ছিলেন। ১৯৩৪এর ১৫ ডিসেম্বর ডিএর জলপানি পাওয়া গবেষক এবং সমিতির পরামর্শদাতা জিতেন্দ্রনাথ বসু Engineering and industrial Germany বক্তৃতা জার্মান দেশে ছাপা হয়। ১৯৩৯এ বিনয় সরকারকে জার্মানি থেকে সেই বই পাঠানো হয়। ভাষণ শুনতে কলকাতার জার্মান উপরাজদূত এবং Horst Pohle উপস্থিত ছিলেন।

১৯৩৬এর পর থেকে বিনয় কুমার সরকার বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ন্যাশনাল সোসালিজমের রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় তুলে আনলেন। উদ্দেশ্য উপনিবেশিক সংবাদপত্রে নাজি বিরোধী

প্রচারের পাল্টা প্রচার চালানো। ডিএর Mitteilungen পত্রিকা ১৯৩৭এর এপ্রিল সংখ্যায় লেখা হল, ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট কিছু চক্র 'জার্মানি বিষয়ে অবন্ধুরমত আচরণ করছে', 'পত্রিকাগুলো আজকের জার্মানি বিষয়ে বিদ্বেষপূর্ণ' বিষয় প্রকাশ করে জনগণের মন বিষাক্ত করে তুলছে – এই প্রচারক্রমের মোকাবেলায় আমাদের সক্রিয় হতে হবে।' লেখা হচ্ছে 'আমরা ভাগ্যবান বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদের নেতৃত্ব দিয়ে প্রথিতযশা বিনয় কুমার সরকার সাম্প্রতিককালে জার্মানি বিষয়ে সত্য তথ্য প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।' পত্রিকাটি ১৯৩৬ বছরটি জুড়ে সংসদ আয়োজিত বক্তৃতার শীর্ষক আর বক্তার নাম তুলে বলছে, এ সব আলোচনা জার্মান নিয়ে ভারতবর্ষীয় জনগণের মধ্যে সত্য প্রচার করেছে - এই বক্তৃতাগুলো হল বিনয় সরকারের Winterhilfswerk or Winter Relief Measures in Germany, বীরেণ রায়ের Aviation in the German Reich আর প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাসের Eugenic Research in Germany।

বৈমানিক বীরেন রায় উপনিবেশিক প্রশাসকদের চোখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী শক্তির বন্ধু। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্টে দেখি নাজি দলের হয়ে প্রচারের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য পেতেন। আগের স্তবকে দেখলাম বীরেন রায় সমিতির মঞ্চে জার্মান দেশে মোটর বিদ্যার অগ্রগতি সম্বন্ধে বহুল প্রশংসাসূচক বক্তৃতা দিয়েছেন।

উল্লিখিত আরেক বক্তা কাইজার উইলহেল্ম ইন্সটিটিউটের (KWI-A নৃতত্ত্ব বিভাগ ১৯৩৩এর জুলাই মাস থেকে তৃতীয় রাইখ, নাজি জাতি আর ইউজেনেটিক্স তাত্ত্বিকতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। KWI-A থার্ড রাইখের জাতিবাদী নীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বন্ধ্যাত্বকরণ আইন, রাইখ [রক্তের শুদ্ধতা নির্ভর] নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন এবং নাজি তাত্ত্বিকতা বিকাশে অর্থ সাহায্য পেয়েছে; এ বিষয়ে বিশদে জানতে https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160932704001115 দেখতে পারেন) ছাত্র প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি জলপানি নিয়ে বার্লিনে আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ট ফাউন্ডেশনে পড়াশোনা শেষে সমিতি আর ডিএর নিয়মিত প্রচারক হলেন। তাঁর গবেষণা নির্দেশক ছিলেন কাইজার উইলহেল্ম ইন্সটিটিউটের race hygienist, ইউজিন ফিশার। ইউজিন নাজি পার্টির জাতিগত রাজনীতিকে মান্যতা দিয়েছিলেন, পরে দলে যোগও দিয়েছেন। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬এ প্রফুল্ল বিশ্বাস নাজি জাতিবাদের প্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের মনুস্মৃতিকে ইউজেনেটিক্স বা সুপ্রজনন বিদ্যার সূত্রে ব্যাখ্যা করেন। 'বংশপরম্পরায় বিকলাঙ্গ প্রজন্ম তৈরি হওয়া রুখতে' নাজিদের ১৯৩৩এর আইনকে কার্যত বৈধতা দেন তিনি। এই আইন বলে নাজি জার্মান রাষ্ট্র হাজারো মানুষকে বন্ধ্যা করে এবং বাঁচার অযোগ্যদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা

করে। প্রফুল্ল বিশ্বাস ১৯৪৭এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁকে নিয়ে আমরা আলাদা প্রবন্ধ রেখেছি।

প্রফুল্ল বিশ্বাসের বক্তৃতার মুখবন্ধ হিসেবে বিনয় সরকার সুপ্রজননবিদ্যাকে হিন্দু প্রথা বললেন। তাঁর মতে অসবর্ণ বিবাহ (এক্সোগ্যামি) আর অন্তঃবিবাহ, দুই হিন্দু ধারণা ঐতিহ্যগতভাবে ইউজেনেটিক্সের অংশ। Winterhilfswerk (Winter Relief of the German People) বিষয়ে ১৪ মে ১৯৩৬এ বক্তৃতায় বিনয় সরকার বললেন শীতে জার্মানদের জন্যে হিটলার অনুসৃত দানধ্যান প্রথাকে ভারতবর্ষের [শাসকদের] অনুসরণ করা দরকার। নাজিদের হয়ে প্রচার চালানোর বাধ্যবাধকতায় বিনয় সরকার ভুলে গিয়েছিলেন জার্মান সরকারের Winterhilfswerk প্রকল্পে সব জার্মান অন্তর্ভূক্ত ছিল না। নাজি রাজনীতিকেরা যাদের জাতিগতভাবে আর রাজনৈতিকভাবে দান পাওয়ার যোগ্য মনে করত, তাদের সাহায্য করা হত Winterhilfswerk প্রকল্পে।

Winterhilfswerk বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সর্বদানন্দ এবং মিশনের মহারাজেরা। আর ছিলেন জার্মান বিদেশ দপ্তরের কাউন্সিল এডয়ার্ড ভন সেলজাম সহ অন্য আধিকারিক। এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানের এজেন্ডা শুধু যে বিনয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে নাজিবাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিলনের তাত্ত্বিক অবস্থান উপস্থিত করা ছিল তাই নয়, তাঁর এই বিশেষ দিনের বক্তৃতা সূত্রে বুদ্ধিস্ট হল হয়ে উঠল আগামী দিনের নাজিবাদীদের সঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রবক্তাদের মিলন ক্ষেত্র (রাজনীতি করা ধর্ম সংগঠনগুলোর সঙ্গে নাজি যোগ নিয়ে বৈজয়ন্তী রায়ের Hakenkreuz, Swastika and Crescent The Religious Factor in Nazi Cultural Politics Regarding India অনুবাদ করেছি এই বইতেই)।

রামকৃষ্ণ মিশনও জার্মান পণ্ডিতদের মিশনের কাজে যুক্ত করতে উৎসাহী হয়। বহু জার্মান পণ্ডিত, প্রচারক মিশনের আধ্যাত্মবাদের টানে কাজের যোগসূত্র তৈরি করেন। ১৯৩৪এর মার্চে মিশনের আবেদন ছিল 'প্রবুদ্ধ ভারত'এর ইংরেজি সংস্করণকে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে মান্যতা দেওয়ার। ডিএর বহু পণ্ডিত প্রবুদ্ধ ভারতের গ্রাহক হন। ৭ এপ্রিল ১৯৩৭এ, রামকৃষ্ণদেবের জন্মদিনে বুদ্ধিস্ট হলে পাঁচজন জার্মান পণ্ডিতের পাঠানো জার্মান দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ, পাঁচজন মিশন মহারাজ পাঠ করেন।

বিনয় সরকার ১৯৩৭এর জানুয়ারিতে হেরমান গোয়েরিংএর চার বছর পরিকল্পনার প্রভূত প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন। ৩১ জানুয়ারি Economic aspects of the German Four Year Plan বক্তৃতায় ১৯৩৩-৩৭এর এবং তার পরের চার বছরের পরিকল্পনায় নাজি জার্মানির অর্থনীতি নিয়ে বিশদে আলোচনা

করেন।

১৯৩৮এর ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা নথি দাবি করছে ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭এ বিনয় সরকারের নেতৃত্বে নাজিপক্ষীয় সমিতি যুবা বাঙালিদের নাজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে জার্মান কনসুলেট থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছে। বিনয় সরকারের নেতৃত্বে বটকৃষ্ণ ঘোষের সক্রিয়তায় সমিতির ছাত্র গোষ্ঠী সম্বন্ধে হয়ত এই ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। ১৯৩৯এর ১৪ মে দ্য স্টেটসম্যানের 'ভারতবর্ষে নাজি প্রোপাগান্ডা' সংবাদের দাবি জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের অর্থ সাহায্যে নাজিপক্ষীয় বাঙালি সমিতি কলকাতায় নাজি প্রচারে সক্রিয়। এর পরেই বিনয় সরকার ব্রিটিশ সরকারের নজরদারি আর প্রচারযন্ত্রের সক্রিয়তার গুরুত্ব বুঝে সমিতির কার্যকলাপে নাজি সহায়তা পাওয়া বা নাজি দল, রাষ্ট্র উত্থানের সঙ্গে সমিতির কাজকর্ম মেলানোর প্রচার খণ্ডন করতে ১৯৩৯এর মে মাসের বক্তৃতা অনুষ্ঠানে দাবি করেন বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ ১৯৩২এ নাজিরা ক্ষমতায় আসার আগেই তৈরি হয়।

বার্লিনের ফেডারেল আর্কাইভসে বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদএর সদস্যরা কী কী Course of studies and investigationsএ অংশ নিয়েছিল তার তালিকা হল - বীরেন দাশগুপ্তের Travels in Germany, নরেন্দ্র নাথ ল'এর

Bangiya Jarman Vidya Samsad at home

German influence on Indian thought, অমূল্যচরণ উকিলের German achievements in medicine, surgery and hygiene, বিনয় কুমার সরকারের Economic, Social and Constitutional developments of the German People, নলিনাক্ষ দত্তের The Progress of Indology in Germany, সুষমা সেনগুপ্তের Women's activities in Germany আর প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর German journalism। একটা বিষয় পরিষ্কার জার্মানির উত্থান প্রকল্প প্রচারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকা বক্তারাও সমিতির অনুষ্ঠানে জার্মান রাষ্ট্রের কৃতি বিষয়ে বলার সুযোগ পেয়েছে এবং জার্মানেরা কলকাতার অভিজাত মহলে তাদের প্রভাব বাড়াতে সমতির কার্যকলাপ ব্যবহার করেছে।

জার্মান বিদেশ মন্ত্রকের রাজনৈতিক আরকাইভে সমিতির কলকাতার কার্যকলাপ বিষয়ে ছবি প্রতিবেদনের পুস্তিকার নমুনা আছে। ১৯৩৮এর ১০ জানুয়ারির ছবির শীর্ষক Bangiya Jarman Vidya Samsad at home। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কোনও এক অভিজাত রেস্তোঁরার টেবলে একদল মানুষ বসে আছেন। তিনটে টেবলে বসা বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদের কোট টাই আর শাড়ি পরা ৩৬ সদস্যর মধ্যে আছে সংগঠন প্রতিষ্ঠাতা বিনয় কুমার সরকার, বীরেন রায়, সতীন দাশগুপ্ত। সতীন দাশগুপ্ত সমিতির সম্মানিক সদস্য ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোংএর ম্যানেজিং ডিরেক্টর (perspectivia.net/servlets/MCRFileNodeServlet/pnet_derivate_00006270/roy_bengali_society.pdf)। আছেন জার্মান দূতাবাসের রাজদূত কাউন্ট আর্ডম্যান গ্রাফ ভন পোডেউইলিস-ডুরনিজ (Count Erdmann Graf von Podewillis-Dürniz) আর কমার্শিয়াল এজেন্ট কার্ল রাসমুস (Carl Rassmuss)। আছেন মনস্তত্ত্ববিদ দার্শনিক কার্ল ইয়ুং, জাতিতাত্ত্বিক এগন ফ্রেইহার ভন এইকস্টেড। এইকস্টেডের তত্ত্ব নাজি শাসক অভিজাতদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। ছবিটা হয়ত ভন এইকস্টেডএর সম্মানে তোলা হয়েছিল। তিনি ১৯৩৮এর জানুয়ারিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছিলেন।

আশ্চর্যের নয়, ১৯৩৮এর বার্লিনের বিদেশ দপ্তর কলকাতার জার্মান বিদেশ দপ্তরকে রিপোর্টে জানাল কলকাতাস্থ বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদই ভারতবর্ষের জার্মান-ভারতবর্ষ কৃষ্টি যোগের ক্ষেত্র সব থেকে প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। জার্মানিতে পাঠ নিতে যাওয়া ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের একজোট করে তাদের মধ্যে জার্মান দেশের সঙ্গঠন, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা বিষয়ে উতসুক্য তৈরি করার কাজে আত্মনিয়োগের বিষয়টি তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

সমিতির শেষ কাজ ছিল বিনয় কুমার সরকারের ২৯৩৯এর ২০ মার্চের বক্তৃতা New tendencies in German Social Philosophy। তারপরে আর সমিতির সক্রিয়তা বিষয়ে খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না।

আমাদের এই আলোচনায় একটা বিষয় পরিষ্কার বিনয় সরকারের নেতৃত্বে কলকাতায় বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদের গড়ে ওঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বর্ণীল কল্পনা আর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে বিনয় সরকারের ব্যক্তিগত প্রকল্প হিন্দু স্পিরিটের সঙ্গে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান অগ্রগতিকে মেলানো। সমিতিতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তৃতা জার্মানির বিজ্ঞান আর শিল্পকলা-সাহিত্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের উৎসুক্য কিছুটা হলেও অপনোদন করেছে, কিন্তু সংগঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি বিষয়ে বিশেষ করে ন্যাশনাল সোসালিজম বা নাজিদের নানান তথ্য জনগণের মধ্যে প্রচার করা এবং নাজি জার্মান বিষয়ে বিরোধী প্রচারের পাল্টা প্রচার চালানো। ১৯৩০এর দশকে বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ কলকাতায় নাজি কর্মকাণ্ডের প্রধানতম মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল।

সূত্র - বৈজয়ন্তী রায়, দ্য বেঙ্গলি সোসাইটি অব জার্মান কালচার ইন জার্মান আরকাইভস

বদ বংশ - নাজি সুপ্রজননবিদ্যা এবং দিল্লিতে নৃতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ
বান্দে আহমদি হোদার প্রবন্ধ ভিত্তি করে বিশ্বেন্দু নন্দ

১০ নম্বর পুথিতে সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে নাজি যোগের ইতিহাস নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রথমে নজর পড়ল কলকাতায় বিনয় কুমার সরকার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদের কাজকর্ম। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ‘বিনয় কুমার সরকার এবং কলকাতার নাজি-বন্ধু বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ উপনিবেশে ফ্যাসিবাদ’ প্রবন্ধে। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, জার্মানিতে নাজি দলের আর্থিক সহায়তায় শিক্ষা গ্রহণ করা প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাসকে নিয়ে, সূত্র Hoda Bandeh-Ahmadi, The Bad Stock’: Nazi Eugenics and the Growth of Anthropology in Delhi প্রবন্ধ। প্রফুল্ল বিশ্বাস দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক, কিন্তু আজ বিস্মৃত। তিনিই প্রথম দিককার ভারতবর্ষীয়, যিনি জার্মান জাতিবাদী জৈবিক তাত্ত্বিকতা ভারতে প্রোথিত করেছেন। হোদা বলছেন, উপনিবেশিক ভারতের নৃতত্ত্ব বিদ্যার বিকাশ বুঝতে, উপনিবেশিক ব্রিটিশ নৃতত্ত্ব অথবা বঙ্গভঙ্গের পরে আমেরিকিয় নৃতত্ত্বের প্রভাব, এর সঙ্গে এক চুটকি ফরাসি নৃতত্ত্ব সমাজ নিয়ে আলোচনাই যথেষ্ট। কিন্তু টমাস ট্রাউটম্যান আরিয়ান্স এন্ড ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় বলছেন ভারতবর্ষের ভদ্রবিত্তের বৌদ্ধিকতার বিকাশে ম্যাক্সমূলারের অবদান ছাড়াও নাজি জার্মানিতে লালিতপালিত নৃবিদ্যার বড় অবদান রয়েছে। Hoda Bandeh-Ahmadi সাড়ে তিন বছর উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করেছেন। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁর দিল্লি ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা অংশটুকুতেই মনোনিবেশ করব। হোদার বক্তব্য দেশ ভাগের পরে ভারতের অধিকাংশ নৃতত্ত্ব বিভাগ তৈরির সময়ে আমেরিকার নৃতত্ত্ব বিদ্যা বিকশিত চারটি তাত্ত্বিক ফিল্ড প্রভাবিত করে - প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ/কৃষ্টি, ভাষাতত্ত্ব এবং জৈবিক/শারীরিক নৃবিজ্ঞান। কিন্তু বাস্তবে ভারতে ভাষাতাত্ত্বিক নৃতত্ত্বের কাজ হয় নি বললেই চলে - যা হয়েছে জৈবিক/শারীরিক নৃতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। মাথায় রাখা দরকার ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সাধারণত নৃতত্ত্ববিদ্যাকে এড়িয়ে চলেন। হয় তারা নিজেদের দপ্তরেই সারাজীবন কাটান, খুব বেশি হলে প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের সঙ্গে মিলে কাজ করেন, এর বাইরে তাদের খুব একটা জোটবদ্ধ হতে দেখা যায় না। ভারতজুড়ে শয়ে শয়ে সমাজতত্ত্বের এলিট সঙ্গঠন তৈরি হলেও আজও বৌদ্ধিক জগতে নৃতত্ত্বের নাম প্রায় অজানা, খুব বেশি হলে নৃতত্ত্ব নিয়ে ৪০টা সঙ্গঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক বিভাগ মনে করে নৃতত্ত্ব বিভাগ আর তাদের অনুসৃত জ্ঞানচর্চা আজও উপনিবেশপূর্ব সময়ের মত বাতিল হয়ে যাওয়া মানুষের দেহ মাপার কাজ করে। হোদার বক্তব্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব দপ্তরগুলো নিয়ন্ত্রণ করে জৈবিক/শারীরিক নৃবিজ্ঞান [তাই এই ধারণাটি আজও প্রবল]।

বিশ্বের বহু পরিবারের বংশলতিকাতে ‘বদ শাখা’, ‘বদ কাণ্ড’ রয়েছে - যার সমস্যাজনক অতীতযোগ অধিকাংশ সময় সযত্নে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়। অধিকাংশ সময় সে সব অকহতব্য বংশ পরম্পরা সাজিয়েগুজিয়ে উপস্থাপনযোগ্য করে করে তুলে ধরা হয় যাতে কদর্য অতীত সহজেই ঢাকা পড়ে। পড়াশোনার-বুদ্ধিবৃত্তিক জগতও এর ব্যতিক্রম নয়। হঠাৎ করে সৌন্দর্যময় অনুসরণযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসকে ব্যঙ্গ করেই যেন অতীতের অকহতব্য ঘটনাগুলো নতুন করে ভেসে উঠে অসহায় খাদের ধারে দাঁড় করায় - বুঝতে পারি না, কীভাবে অতীতের সে সব সমস্যা আমরা আজকের দিনে মোকাবেলা করে সে সব চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের মুখোমুখি হ’ব।

দিল্লি ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ব বিভাগ বঙ্গভাগের ঠিক আগে, ১৯৪৭এ শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক (https://allegralaboratory.net/insiders-outsiders-and-intellectual-kinship-universitycrisis/) প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বেশ কয়েকবার ‘বিনয় কুমার সরকার এবং কলকাতার নাজি-বন্ধু বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ

উপনিবেশে ফ্যাসিবাদ’ প্রবন্ধে বেশ কয়েকবার এসেছেন (Profulla Chandra Biswasএর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৬এ শেষ করা অপ্রকাশিত গবেষণা ‘Uber Hand-und Fingerleisten von Indern’। জন্ম বছর ১৯০৪)। প্রফুল্ল বিশ্বাস নাজি জাতিবাদী তাত্ত্বিক ইউজিন ফিশারের অধীনে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা শেষ করেন। দেশ ভাগের আগে দিল্লি ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রথম অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। হোদা বলছেন, প্রফুল্ল বিশ্বাসের সুপ্রজনবিদ্যা নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ ইউনিভার্সিটির আরকাইভে আছে। প্রবন্ধগুলোর ভাষ্য থেকে পরিষ্কার তিনি নাজিপন্থী তো ছিলেনই সঙ্গে নাজি সুপ্রজনবিদ্যারও অনুগামী ছিলেন।

হোদা, প্রফুল্ল বিশ্বাসের নাজি যোগ আবিষ্কার করে অস্বস্তিতে পড়েন - বুঝতে পারছিলেন না, তাঁর এই আবিষ্কার দিল্লি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষকেরা কীভাবে নেবে। তিনি প্রায় প্রত্যেক অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রত্যেকবারেই তাঁর একই অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। প্রফুল্ল বিশ্বাসের বৌদ্ধিকতাকে অস্বীকার করা জনৈক প্রবীন অধ্যাপকের কথা তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। ছাত্রাবস্থায় সেই প্রবীণ অধ্যাপক প্রফুল্ল বিশ্বাসকে দেখেছেন। একটা ল্যাপেলওয়ালা কালো কোট পরে তিনি ক্লাসে আসতেন, ‘কোটটা দেখেছ’ বলেই হাত মেলানোর ঢংএ হাত বাড়িয়ে বলতেন ‘হিটলার’; হোদা বলছেন, প্রফুল্ল যেন বোঝাতে চাইতেন, তিনি এই কোট পরে হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই অধ্যাপক জানান এন এস রেড্ডি, প্রফুল্ল বিশ্বাসের বৌদ্ধিক চুরি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, সাঁওতালদের নিয়ে প্রফুল্ল বিশ্বাসের বই ‘ভারতীয় নৃবিজ্ঞান বিদ্যার প্রতি অযোগ্য ‘ডিসসার্ভিস’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন [এবং] বলেছেন, এই বই সাঁওতালদের বর্তমান জীবন এবং সংস্কৃতি চিত্রিত করতে চরম ব্যর্থ হয়েছে।’ হোদার পাদটিকার মন্তব্য, বৈদ্ধিক চুরির অভিযোগে প্রফুল্ল বিশ্বাসের অধ্যাপনার কেরিয়ারে দাগ পড়ে নি। চুরির অভিযোগে প্রবন্ধ বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে, প্রবন্ধ প্রকাশের দু’বছরের মাথায় পূর্ণ অধ্যাপক হলেন প্রফুল্ল বিশ্বাস। তাঁর জীবন নিয়ে হোদার গবেষণা সূত্রে পাওয়া এত সব তথ্য শোনার পরেও প্রবীণ অধ্যাপক হোদাকে বলেন, ‘এ সব ইতিহাস, ক্রিটিক্যাল-ইতিহাস নয়।’ তিনি আশা করেন, হোদা তথ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কাজ চালিয়ে যাবেন।

হোদা বলছেন স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া প্রফুল্ল বিশ্বাস আজকের নৃতত্ত্ববিদ্যা আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন ঠিকই, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকও নন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর তৈরি নৃতাত্ত্বিক বিভাগ আজ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম নৃতত্ত্ব বিভাগ। স্নাতকেরা বিভিন্ন সংগঠনে যোগ দিয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগ তৈরি করেছেন, সরকারি নৃতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন। প্রফুল্ল বিশ্বাসের অবদান যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি নাজি ইউজেনিক্স এবং বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদী তত্ত্বের সাথে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ গবেষকের মনোযোগী বিশ্লেষণের দাবি জানায়।

গবেষক থিয়াগো পিন্টো বারবোসা, ইরাবতী কার্ভের নাতনি উর্মিলা দেশপাণ্ডের সাক্ষাতকার ‘কন্ট্রাডিকশনস অব ইরাবতী কার্ভে - আ কনভার্সেসান’এ বলছেন ‘জাতিতত্ত্ব’ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানচর্চা নিয়ে গবেষণা করার সময় তিনি জাতিগত বিজ্ঞানের ট্রান্সন্যাশনাল নেটওয়ার্কগুলিতে অতীতের এক জাতিবাদ বিশেষজ্ঞর মুখোমুখি হচ্ছেন - ইরাবতী কার্ভে। জন্ম বার্মায় ১৯০৫এ। ‘১৯২০র দশকের শেষে বার্লিনে তাঁকে একদা অতিকুখ্যাত সংগঠন কাইজার উইলহেল্ম ইন্সটিটিউটের নৃতত্ত্ব, মনুষ্য বংশগতি এবং সুপ্রজননবিদ্যা (KWI-A) বিভাগে দেখি ডক্টরাল গবেষণায়। ‘ম্যানুফ্যাকচারিং রেস’ নিয়ে আরকাইভাল গবেষণায় অবাক হয়ে দেখি কোরিয়া, চিন, ভেনিজুয়েলা বা ভারতবর্ষ থেকে ইরাবতী কার্ভের মত অসাদা, অইওরোপিয় ছাত্রদল, তাদের গালি দেওয়া ইন্সটিটিউশনে পাঠ নিতে আসছে। আমার প্রশ্ন সেই সময়ে এবং ক্ষেত্রে জারিত মূলধারার তত্ত্বগুলিতে জাতিগতভাবে নিকৃষ্ট দাগিয়ে দেওয়া গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা কেন KWI-A-তে জাতি এবং ইউজেনিক্স সম্পর্কে জানতে এবং গবেষণা করতে চাইছে? কি ধরনের জ্ঞান তারা তৈরি করছে, বা নতুন করে কী ধরণের জ্ঞানের বিকাশ ঘটছে সেখানে? তারা কি তাদের সাদা সহকর্মী এবং পরামর্শদাতাদের থেকে আলাদা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে? তারা কি অধ্যাপকদের বর্ণবাদী পক্ষপাত অস্বীকার করেছেন, না কী সেই সব জাতিগত তত্ত্বকে নিজের জীবনে মানিয়ে নিয়েছেন?’ পিন্টো প্রজিতবিহারী মুখার্জী ‘ব্রাউন স্কিনস হোয়াইট কোটস’ বইতে নন্দিনী সুন্দরের ইরাবতী কার্ভের জীবনী প্রবন্ধের মন্তব্য উল্লেখ করছেন, ‘...তিনি জীবন শুরু করেছিলেন জার্মান জাতি তাত্ত্বিকতায় কিন্তু শেষের দিকে সে প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন।’ তবে প্রজিতের পাদপূরণ হল, জীবনের শেষ দিনগুলোও ইরাবতী বিখ্যাত ইউজেনেসিস্ট, ইউনেস্কোর জাত সংজ্ঞা তৈরি করা এল ডি সাংভির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। তাঁর দাবি ইরাবতী শেষ দিন পর্যন্ত জাতিবাদী প্রকরণ নির্ভর গবেষণা প্রক্রিয়া থেকে বার হতে পারেন নি। ইরাবতী কার্ভের নাজিসংশ্রব আমরা আলাদা প্রবন্ধে আলোচনা করব আর থাকবে উর্মিলার সাক্ষাৎকারও।

নাজি-বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস

সারদাপ্রসাদ বিশ্বাসের পুত্র প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাসের জন্ম কলকাতায়। প্রফুল্ল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতোকোত্তর উপাধি পেলেন ১৯৩১এ। পঞ্চানন মিত্রের নির্দেশনায় আদিবাসী সমাজ নিয়ে গবেষণা শেষে ১৯৩৪এ থার্ড রাইখে হিটলার আসীন হলে আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট ফাউন্ডেশনের জলপানি নিয়ে জার্মানি যাত্রা। জার্মানিতে তিনি যে ব্রিটিশ উপনিবেশ, ভারতবর্ষের একা ছাত্র ছিলেন এমন নয়, ১৯৩৫এ ভারতবর্ষ থেকে ৫২ জন এরকম জলপানি পাওয়া গবেষক পড়তে যান। Irina Nastasa-Matei

'Transnational Far Right and Nazi Soft Power in Eastern Europe: The Humboldt Fellowships for Romanians' প্রবন্ধে দাবি করছেন, ইওরোপিয় ছাত্রদের হামবোল্ট ফাউন্ডেশনের জলপানিতে জুড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল গবেষকদের নাজি প্রচারক তৈরি করা। আজকে যেটা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটি, সেদিন ছিল কাইজার উইলহেল্ম ইন্সটিটিউট অব এন্থ্রোপলজি, হিউম্যান হেরিডিটারি এবং ইউজেনেটিক্স (সুপ্রজনন বিদ্যা) দপ্তর। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ইউজিন ফিশার। তাঁর অধীনে প্রফুল্ল, ইরাবতী দুজনেই গবেষণা করেছেন। ইউনিভার্সিটি অব বার্লিনে প্রফুল্লের দুটো সেমিস্টারে পাঠ্য ছিল 'Uber Hand-und Fingerleisten von Indern' ভারতবর্ষীয়দের হাত ও আঙুলের ছাপ। বার্লিনে পিএইচডি শেষ করে ১৯৩৬এ কলকাতায় ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। ১৯৪৭এ দিল্লি ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক, রিডার, এবং বিভাগীয় প্রধান। কলকাতায় আসা আর দিল্লিতে যাওয়ার মধ্যেকার সময়ে কলকাতাস্থ অর্থনীতিবিদ বিনয় সরকার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদে নাজি তত্ত্ব, নীতিমালা প্রচারে সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাঁর অবদান ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

প্রফুল্ল বিশ্বাসের বৌদ্ধিক উদ্যম থেকে পরিষ্কার, তাঁর জার্মানি প্রবাস এবং নাজি সঙ্গঠনগুলোর সঙ্গে সক্রিয় কাজ জীবনের গতিপথ তৈরি করেছিল। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল নাজি জার্মান রাষ্ট্রের সুপ্রজনন বিদ্যা থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা নিয়ে জনসংখ্যার গুণমান নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ। তিনি ক্ল্যারেন্স গর্ডন ক্যাম্পবেলের মানুষ্য প্রজাতির তিন বংশ তত্ত্ব, প্রথমটি সেরাতম বংশ 'উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত সমাজ নেতা'; মাঝে উত্তম বংশ, 'আইন মেনে চলা স্বাভাবিক নাগরিক'; আর বদ বংশ বা 'দুর্বল মনের, উন্মাদ, দরিদ্র, নিশ্চিতভাবে অপরাধী এবং গুরুতর যৌন অপরাধী' ধারণায় প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন অন্তত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় পর্যন্ত। তিনি মনে করতেন বদ বংশের মানুষেরা সমাজের বোঝা, এদের অধিকাংশ 'বংশগতির সমস্যার জন্যে ত্রুটিপূর্ণ মানুষ হিসেবে জন্মেছে, এদের সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা দরকার (Profulla Chandra Biswas, 'Eugenics: Its Scope and Importance', Calcutta Review 59, no. 3 (1936): 275–83; 282)।

মনুষ্য সমাজকে বদ বংশ দাগিয়ে প্রফুল্ল বিশ্বাস, বহু সুপ্রজননবিদের সযত্নলালিত ধারণা, প্রজননের সমস্যা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াই মনুষ্য সভ্যতা আবশ্যিক দ্রুত আত্মধ্বংসের দিকে ধেয়ে চলেছে, এই তাত্ত্বিক অবস্থানটিকে নতুন করে মান্যতা দিলেন। মনুষ্য সমাজ, বিবর্তনের ধারাকে হতচ্ছেদ্দা করেছে, ফ্রান্সিস গালটনের তাত্ত্বিক অবস্থান উল্লেখ করে লিখলেন মানুষদের দৈহিক ত্রুটি উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে বলেই মনুষ্য সভ্যতায় তা ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হবে। সে সব ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করার

কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভব না করা যায় তাহলে মানব জাতির সামনে সমূহ বিপদ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পরে ১৯৪৯এ কলকাতার জার্নাল অব সায়েন্স ক্লাব পত্রিকায় লিখলেন, 'এই ভয়ঙ্কর বিষয়ের ব্যপ্তি ভেবেই হাড় হিম হয়ে যায় - বদ মানুষদের জন্মের হার সুবংশগতির প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্ম হারের গড়ের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি।'

সুপ্রজনন বিদ্যা ছিল প্রফুল্ল বিশ্বাসের এই কল্পিত সমস্যার সমাধানের একমাত্র হাতিয়ার। প্রথম নিদান ছিল ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের জন্যে গণবন্ধ্যাত্ব প্রকল্প চাপিয়ে দিতে হবে, 'গণবন্ধ্যাত্ব প্রকল্প বিজ্ঞানের নিদানে একমাত্র মানবিক প্রকল্প। মানব সভ্যতার যে সব সৃষ্টি যন্ত্রণাকাতর ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যাদের অবর্ণনীয় ব্যথা প্রতিরোধ করা যায় না, সে সব জীবনকে নীরবে সহ্য করে চলা অমানবিক।' বল প্রয়োগ করে মানুষকে বন্ধ্যা করে তার জন্ম দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়াই মানবিকতা, এবং বন্ধ্যা প্রজারা স্বাভাবিক যৌন জীবন ভোগ করবে, সক্রিয়তায় যৌন ক্রীড়াতেও মিলিত হতে বাধা থাকবে না। জোর করে বন্ধ্যা করার প্রকল্প এই ধরণের মানুষদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলবে না। বন্ধ্যাত্ব ছাড়াও তার নিদান ছিল, ওপরে আলোচিত তিনটে বংশের মানুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা, অথবা বিবাহ হলেও নতুন প্রজন্ম তৈরি করার প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ করার।

তিনি নাজি জার্মান রাষ্ট্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৯৩৭এর সায়েন্স এন্ড কালচার পত্রিকায় লিখছেন, সামগ্রিক জাতির কল্যাণ এবং স্বচ্ছলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জাতি শুদ্ধতার (race hygiene) গুরুত্ব বুঝে, জার্মান রাষ্ট্র আইন করেছে জার্মান জাতির বংশগত রক্ত আর স্বাস্থ্যের শুদ্ধতা বজায় রাখতে। বংশগতির দিক দিয়ে খুঁতওয়ালা প্রজন্মের অভ্যাসগত অপরাধী এবং সামাজিক দুষ্কৃতি তৈরি হওয়া আর জন্ম নেওয়া বন্ধ করতে এই ধরণের আইন খুবই জরুরি।

প্রফুল্ল বিশ্বাসের অধিকাংশ লেখা এবং বক্তব্যে ভারতরাষ্ট্রকে নাজি জার্মানির জাতিতাত্ত্বিক উদ্যম উদাহরণ অনুসরণ করার আহ্বান জানানো থেকে পরিষ্কার, তিনি চাইছেন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি গরীব, দুষ্কৃতি বা মানসিক রোগগ্রস্ত - যাদের তিনি কম ব্যুদ্ধাঙ্কের মানুষ দাগিয়ে দিচ্ছেন, নাজি জার্মানির অনুসরণে, রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিক। প্রফুল্ল বিশ্বাস জাতভিত্তিক বন্ধ্যাত্বকরণের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নেন নি। ইউজেনেটিক্স এন্ড পলুলেশন প্রবন্ধে প্রফুল্ল বিশ্বাস নাজি জার্মানির সুপ্রজনন বিদ্যা আয়ত্ত করার পক্ষে এর প্রাচীনত্বের দোহাই দিচ্ছেন। তিনি বলছেন সুপ্রজনবিদ্যার ধারণাটা নাকী অতীতের গ্রিস আর প্রাচীন ভারতবর্ষের অজানা ছিল না। তাঁর দাবি মনুর বৈবাহিক নীতি থেকে পরিষ্কার প্রাচীন ভারতে সুপ্রজননবিদ্যা ছিল। মনু সংহিতার উদাহরণ ছাড়াও গার্হ্য সূত্র, যাজ্ঞবল্ক সংহিতা, ব্যাস সংহিতার উদাহরণ তুলে প্রমান করার চেষ্টা করেছেন, প্রাচীন ঋষিরা বংশগত ত্রুটিওয়ালা মানুষদের বিবাহে

বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন। সবর্ণদের তথকথিত 'বংশগত স্বাস্থ্য বিশুদ্ধতা' রক্ষাই ইউজেনিক্সের প্রাথমিক রূপ। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিশাস্ত্রে ইউজেনেটিক্সের ধারণার প্রমানে তিনি আন্তঃবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ করার নিদানের কথা বলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানি বা অন্য অঞ্চলে নাজিরা যে ধরণের গণহত্যা, ভয়াবহ সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালিয়েছিল, তিনি আদৌ সে সব তথ্য জানতেন কী না, সে সব কথা তাঁর লেখাপত্র থেকে বোঝা যায় না; এমন কী বিশ্বযুদ্ধের শেষে নাজি নেতারা এ সব কর্মকাণ্ড থেকে হাত ধুয়ে ফেলে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করলেও তিনি কোনও দিন নাজি এপলোজেটিক অবস্থান নেন নি। বরাবরই নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। তবে প্রফুল্ল বিশ্বাস খুঁতওয়ালা প্রজন্মকে এলিমিনেট করার একমাত্র পদ্ধতি বলছেন বন্ধাত্ব, জার্মানির মত গণহত্যা নয়। এইটুকু ছিল তাঁর সঙ্গে নাজি জার্মানির জাতিশুদ্ধতা রক্ষার নিদানের মধ্যে পার্থক্য।

ইউজিন ফিশারের প্রভাব

প্রশ্ন হল, নাজি সুপ্রজননবিদ্যার জালে আপাদমস্তক জড়িয়ে থাকা কলকাতায় প্রশিক্ষিত নৃতাত্ত্বিক প্রফুল্ল বিশ্বাস হিটলারের দেখা পেলেন কোন মন্ত্রে? কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর প্রফুল্ল বিশ্বাস বার্লিনের কাইজার উইলহেল্ম ইন্সটিটিউট অব এন্থ্রোপলজি, হিউম্যান হেরিডিটি এন্ড ইউজেনেটিক্স সংগঠনের (KWI-A) গবেষণা নির্দেশক ইউজিন ফিশারের ছাত্র ছিলেন। ফিশারের জাতিতত্ত্ব Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene বা মানব বংশগতি এবং জাতিগত স্বাস্থ্যবিধি বই হিটলার মনে দিয়ে পড়তেন, নিজস্ব গ্রন্থাগারে ছিল। নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান পরিষ্কার করতে এবং নাজিতত্ত্ব বিকাশে তিনি বইটির উপাত্ত কাজে লাগান। ফিশার পরের দিকে নাজি দলে যোগ দেন। নাজি রাষ্ট্রের সমর্থনে এবং রাষ্ট্র কাঠামো গড়নে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগের প্রধান কারিগর হয়ে ওঠেন তিনি। জাতি আদালতে অংশ নিয়ে তিনি নৃতত্ত্বের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োগ করে জনগণের জাতিগত প্রোফাইল এবং শ্রেণী বিভাগ করে তাদের কাউকে শ্রমিক ক্যাম্প, কাউকে বন্ধ্যা করার কারখানায়, কাউকে গবেষণার জন্যে গিনিপিগ বানানো অথবা গণহত্যার জন্য কন্সট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর শংসাপত্র তৈরি করতেন। নাজি তাত্ত্বিকদের সাফাই হল এই গবেষণা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা পূরণ করার জন্যে করা হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই। নাজি জার্মানির হাতে গোণা পণ্ডিত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় স্বাধীনভাবে কাজ করলেও গবেষণাগারে কাজ করা অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের কাজকর্ম বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল না। তাছাড়া অধিকাংশ উচ্চকোটির পণ্ডিত কেরিয়ার তৈরি, সম্মান আদায়, ক্ষমতার কাছে থাকার জন্যেও নাজি তত্ত্বের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

প্রফুল্ল বিশ্বাসের প্রবন্ধগুলোর বক্তব্যে সাধারণভাবে ইউজিন ফিশারের

তাত্ত্বিকতার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনি। অধিকাংশ লেখায় ফিশারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। প্রফুল্ল মনে করতেন ফিশার শুধু জার্মানিই নয়, আন্তর্জাতিক সফল তাত্ত্বিক। গর্বিত স্বরে লিখছেন ১৯২০র দশকে ফিশারকে ইন্সটিটিউট তৈরি করে বংশগতি গবেষণায় আহ্বান জানানো হলেও বেশ কিছু সময় পর ইন্সটিটিউট যখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে, সে সময় আমেরিকার ধনকুবের রকফেলারেরা তাঁর পিছনে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ফিশারের সঙ্গঠনকে পতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। রকফেলারদের সাহায্যের পরে জার্মান সরকার ফিশারের গবেষণায় সাহায্য করার জন্যে দ্বিগুণ মানবসম্পদ এবং আরও বড় অর্থ সাহায্য করেছে।

প্রফুল্ল বিশ্বাসের নাজি সুপ্রজননবিদ্যায় আস্থা ছিল। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও নাজি নৃতত্ত্বকে অন্য ইওরোপিয় নৃতাত্ত্বিকদের মত ঝেড়ে ফেলেন নি। ফিশারের আরেক ছাত্র ওমোর ভন ভারশুয়ারের (Otmar von Verschuer) গবেষণা সূত্র অবলম্বনে প্রফুল্ল জানান সামাজিক সমস্যার মূলে মিশ্র বংশগতি। তিনি গবেষণা শেষ করার পরের বছরই জোসেফ মেঙ্গেলে (Josef Mengele) ফ্রাঙ্কফুর্টে ভারশুয়ারের সহকারী হিসেবে যোগদান করেন এবং ভারশুয়ার যোগদান করলে, তিনিও বার্লিনস্থ সঙ্গঠনে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং যৌথভাবে বেশ কিছু গবেষণার কাজ করেন। একইভাবে থার্ড রাইখের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জার্মান জীববিজ্ঞানী, শিক্ষক এবং গবেষক কারিন ম্যাগনুসেন, কাইজার উইলহেম ইনস্টিটিউটের নৃতত্ত্ব, মানব বংশগতি এবং সুপ্রজনবিদ্যা বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৯৩৬এর রেস অ্যান্ড পপুলেশন পলিসি টুলস গবেষণায় জোসেফ মেঙ্গেলের সরবরাহকরা চোখের মণির রঙের পার্থক্যের (হেটেরোক্রোমিয়া ইরিডিস (ভিন্ন রঙের চোখ)) নমুনা ব্যবহার করে আউশউইৎস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের ওপর গবেষণা চালান। জোসেফ মেঙ্গেলে আউশউইৎসএর মেডিক্যাল বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। নাম ছিল 'মৃত্যুর দেবদূত'। আউশউইৎস থেকে KWI-Aতে শিশুদের কাটা মাথা কঙ্কাল, চোখ, ভ্রূণ 'গবেষণার জন্যে' পাঠানো হত।'

প্রফুল্ল বিশ্বাস, কারিন ম্যাগনুসেনের মত সুপ্রজনবিদের অসুস্থ ক্ষমতা-প্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৩৬এই ইউজেনেটিক্স - ইটস স্কোপ প্রবন্ধে লিখলেন, 'জার্মানির ভন ভারশুয়ার 'ডক্টর অফ হেরিডিটি' নামে খ্যাত হয়েছেন। প্রতিভাবান ডাক্তার রোগী দেখেন, তাদের পরামর্শ দেন এবং খুব প্রয়োজন হলে তার চিকিৎসাও করেন; উত্তম বংশগতি ধারা থেকে আসা এই ধরণের 'বংশগতির চিকিৎসক'দের জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের দায় আছে। ...এই ধরণের দায়িত্ববান বংশগতি ডাক্তারেরা তদন্ত করেন, খুঁজে পেতে স্বাস্থ্যকর বংশধারাগুলো যাতে বেঁচে থাকে সেটা দেখেন এবং সেই তত্ত্ব প্রচার করেন। সঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পরামর্শও দেন।'

ডার্মাটোগ্লাইফিস (Dermatoglyphics)

প্রফুল্ল বিশ্বাসের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রভাব পড়েছিল তার গবেষণায়। তার গবেষণা বিশ্লেষণ করে আমরা আন্দাজ করতে পারি তিনি কোন কোন বিতর্কে প্রবেশ করছেন, এবং গবেষণা শুরুর সময়েই বা তিনি কোন অবস্থান গ্রহণ করছেন। তিনি মূলত ডার্মাটোগ্লাইফিস বিশেষজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ হাতের ছাপ, আঙ্গুলের ছাপ, ঠোঁটের ছাপ, চুলের পাকের ধরণ নিয়ে তাঁর কাজ ছিল। আমাদের প্রশ্ন হল তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করার সময় এই বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করলেন কোন রাস্তায়? ছন্দক সেনগুপ্ত (Chandak Sengoopta, Imprint of the Raj: How Fingerprinting Was Born in Colonial India (London: Macmillan, 2003)) বিশদে লিখছেন, ব্রিটিশ রাজ আমলা উইলিয়াম জেমস হার্শেল কীভাবে বহু দেওয়ানি মামলার আইনি ঝঞ্ঝাট সামলাতে হাতের ছাপের প্যাটার্ন বিশ্লেষণ গবেষণায় প্রণোদিত হলেন। এই ধরণের প্রজা চিহ্নিকরণের হাতিয়ার উপনিবেশে আবিষ্কৃত হয়ে মেট্রোপলিটনে যাত্রা করে। মেট্রোপলিটনে সুপ্রজননবিদ ফ্রান্সিস গাল্টন ফৌজদারি মামলা সাল্টাতে একে forensic প্রমান হিসেবে কাজে লাগান। ১৮৯০এর দশক থেকে এই ধরণের ‘বৈজ্ঞানিক’ চিহ্নিতকরণের বিদ্যা ব্যবহার করে উপনিবেশ বিভিন্ন ‘অপরাধপ্রবণ আদিবাসী’ সমাজের সদস্যদের গতায়াতে নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি চালিয়েছে।

আঙ্গুলের রেখা গর্ভাবস্থাতেই তৈরি হয়। তাই সুপ্রজননবিদেরা আঙুলের রেখাকে মনে করেন বংশগতির চিহ্ন। আঙুলের রেখা ব্যক্তি মানুষের পরিচয়। কিন্তু সুপ্রজনবিদেরা এই রেখার শ্রেণী বিন্যাস করে মনুষ্য সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করেন। যে সব সুপ্রজননবিদ ভাল বা বদ বংশের রোগ নিয়ে মনুষ্য সমাজ ভাগ করেন, তারাই হাতে রেখাকে হাতিয়ার করে মনুষদের উত্তম, মধ্যম এবং বদ বংশে ভাগ করেছেন। যদিও ডার্মাটোগ্লাইফিসএর উদ্ভব নাজি আমলেও নয় অথবা এটি সুপ্রজননবিদ্যাজাতও জ্ঞান নয়, তা সত্ত্বেও KWI-Aএর বৈজ্ঞানিকেরা এই বিদ্যা নিয়ে ফিশারের নির্দেশে প্রভূত গবেষণা চালিয়েছেন।

গবেষণাপত্রে প্রফুল্ল বিশ্বাস ফিশারকে গবেষণার বিষয় বেছে দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। KWI-Aতে গিয়র্গ গাইপেল বিকশিত আঙুলের রেখা বিশ্লেষণের পদ্ধতির ভিত্তিতে আজকের বায়মেট্রিক ডেটা স্ক্যানার তৈরি হয়েছে (reed.edu/art/ondrizek/exhibitions/origins-of-biometric-data-seattle/)। গাইপেলের পদ্ধতি অবলম্বনে নিজের ৫০ ছাত্রের আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করেছেন প্রফুল্ল বিশ্বাস। কিন্তু তিনি পাঠককে ধারণা দিলেন গোটা দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের থেকে আঙুলের রেখার নমুনা নিয়েছেন। প্রফুল্ল বিশ্বাসের নমুনা নেওয়ার ধরণ থেকে পরিষ্কার, তিনি বাংলার সবর্ণ, অভিজাতদের থেকে জোগাড় করা তথ্য নিয়েই গবেষণা

চালিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন দক্ষিণ এশিয়া অভিজাতদের বিচরণ অঞ্চল। তিনি নিজের জোগাড় করা উপাত্তের সঙ্গে আরও কিছু ইওরোপিয় উপাত্ত জোগাড় করে সেই ছবিগুলির শ্রেণীবিভাগের পরিকল্পনা করলেন এবং আঙুলের রেখার চক্রের আকারের (লুপ প্যাটার্নস) চরিত্রকে কোয়ান্টিফাই করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল ভারতের চক্রের প্যাটার্নের সঙ্গে ইওরোপিয় চক্রের মিল রয়েছে; অর্থাৎ ভারতীয়দের হাতের রেখার সঙ্গে মোঙ্গলিয় বা পীত জাতির যোগসূত্র নেই বরং মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলোর মিল রয়েছে। প্রফুল্ল বিশ্বাস, জাতিগত শ্রেণীবিভাগ করে কীভাবে (অভিজাত, উচ্চবর্ণ, পুরুষ) ভারতীয়রা অন্য গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত ছিল সে বিষয়ে একটি বিতর্ক তৈরি করছিলেন, যা তাঁর পরবর্তী সময়ের কাজের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এবারে আমরা ভারতবর্ষীয় আর জার্মান প্রেক্ষিতে এই শ্রেণীবিভাগের অর্থ বোঝার চেষ্টা করব।

জার্মান-ভারতবর্ষের মধ্যে জাতিগত থাকবন্দীত্বের জোট

প্রফুল্ল বিশ্বাসের জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসটি সে সময়ে কল্পিত জাতিগত থাকবন্দীর প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষীয়দের অনেকটাই জার্মানদের কাছাকাছি নিয়ে এলেও, তিনি বললেন ভারতীয়রা জার্মানদের তুলনায় সামাজিকভাবে নিচু শ্রেণীর মানুষ। এটা যথেষ্টই বিতর্কিত রাজনৈতিক মন্তব্য। মাথায় রাখতে হবে তার এই সিদ্ধান্ত, প্রকাশ্যে হাজার হাজার মানুষের সামনে নাজি জার্মানির তাত্ত্বিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হ্যান্স এফ কে গুন্থারের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। গুরুত্বপূর্ণ হল গুন্থার ছিলেন ফিশারের সঙ্গে প্রফুল্ল বিশ্বাসের গবেষণাপত্রে স্বাক্ষর করা দ্বিতীয় রেফারেন্ট। গুন্থার নাজি জনসমাবেশগুলোয় জার্মানেরা যে ‘শাসক জাতি’ সে কথা বারবার বলবেন, সেই তত্ত্বে আর্যত্ব হয়ে উঠবে বিশ্ব রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি।

গুন্থারের কল্পিত আর্যত্বের ধারণা ভিত্তি করে অতীতের উচ্চমন্য কিন্তু পরবর্তী সময়ের তিন চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাওয়া পতনশীল নর্ডিক জাতির প্রসঙ্গ উঠে আসছিল। ভারতবর্ষের নাজি-বন্ধুরা গুন্থারের এই তত্ত্বে প্রভূত উৎসাহী হলেন কয়েকটি কারনে। প্রথমত গুন্থারের বক্তব্য পরিষ্কার - আন্তঃজাতি বিবাহই উচ্চ জাতির মানুষের রক্ত দূষণ এবং তাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের কারন। ভারতবর্ষের নাজি বন্ধুরা মনে করল তাদের দেশের উচ্চজাতির মানুষেরা একদা নর্ডিকজাত ছিল, পরে নিচুজাতের সঙ্গে বিবাহের ফলে তাদের পতন ঘটেছে - যার ফল ব্রিটিশ পরাধীনতা। দ্বিতীয়ত নাজি বন্ধুরা এই তত্ত্বকে ভারতবর্ষের জাতি ব্যবস্থাকে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে জুড়ে বললেন নাজি রাজনীতিকদের দূষিত রক্ত পরিষ্কারের উদ্যম অনুসরণযোগ্য হোক। তৃতীয়ত নাজিরা জার্মান জাতি নির্ভর খ্রিষ্টপূর্ব নর্ডিক সামাজিক নীতিমালা ব্যবস্থার কথা বলত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়ে হিন্দুত্ববাদীরা মনে করত হিন্দুধর্ম প্রাচীন ধর্মীয় ব্যবস্থার আধুনিক পতিত অবশিষ্টাংশ; ভারতীয় উচ্চজাত আর জার্মানরা উদ্ভুত

হয়েছে নর্ডিক-আর্য পূর্বপুরুষের থেকে।

প্রফুল্ল বিশ্বাসের গবেষণা হিন্দুত্ববাদীদের উচ্চজাতের রক্তের মিশ্রণের ধারণাকে শক্তপোক্ত ভিত্তি দিল। গবেষণায় যে ইওরোপিয় চরিত্রের সঙ্গে জুড়ে থাকা উচ্চবর্ণের সে সব গোষ্ঠীর কথা প্রফুল্ল বলছেন, সে সব গোষ্ঠীকে জার্মানেরা আর্য মান্যতা দিয়ে বলল তারা নর্ডিক তুলনীয় না হলেও কাছাকাছি এবং অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। ধরে নেওয়া হল, উপনিবেশে বাস করা উচ্চবর্ণ ভারতবর্ষীয়রা, অতীতের ভারতবর্ষ বিজয়ী নর্ডিক-আর্যদের আধুনিক প্রজন্ম। তারা অশুদ্ধ রক্তের ভারতবর্ষীয়দের বিবাহ করে পতিত হয়েছে। তাঁর লেখায় উচ্চবর্ণের জাতির শুদ্ধতা বজায় রাখার কথা বারবার উঠে এসেছে। হিন্দুত্ববাদীরা বলল, হিন্দুরা নাজি জার্মানির রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জাতির বেড়া পোক্ত করা আর রক্ত বিশুদ্ধ রাখার প্রক্রিয়া, খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের শুদ্ধ নর্ডিক পূর্বজদের ধর্মের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পারে। তিনি গবেষণায় জার্মানির সামাজিক এবং জাতিগত থাকবন্দীত্ব আলোচনায় আটকে না থেকে জার্মানদের ইওরোপিয় প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশদের তৈরি জাতিগত থাকবন্দীত্ব নিয়েও আলোচনা করেছেন। মাথায় রাখতে হবে আমরা, জ্ঞানগঞ্জের গবেষকেরা অষ্টম পুথিতে দেখিয়েছিলাম কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উপনিবেশ রক্ষায় আর্যতত্ত্ব ব্যবহার করছে। যদিও জার্মান আর্য তাত্ত্বিকেরা ইওরোপিয়দের তুলনায় ভারতবর্ষীয়দের যথেষ্টই নিচু চোখে দেখত, কিন্তু তারা প্রফুল্ল বিশ্বাসের মত সবর্ণ অভিজাত ভারতবর্ষীয়দের অন্য ভারতবর্ষীয় প্রজাদের তুলনায় অনেকটা উঁচু চোখে দেখেছে।

মাথায় রাখতে হবে নাজি জার্মানির সঙ্গে সবর্ণ ভারতীয়দের সম্পর্ক তৈরি করার উদমের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (এবার থেকে সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘ বিষয়ক আর সঙ্ঘের সদস্য সঙ্ঘী) বলল আর্যস্থান ভারতবর্ষেই, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসেনি। মাথায় রাখতে হবে নাজি আর সঙ্ঘী উভয়ের রাজনীতির ভিত্তিও আর্যত্ব। উভয়েই বলত আর্যরা শাসক জাতি।

প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাসের অধ্যাপনা যুগেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব নিয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন সুভাষ বসুর সঙ্গী জার্মান Freda Kretschmar Mookerjee। মিহির বোস রাজ, সেক্রেটস, রেভলিউশন - আ লাইফ অব সুভাষ চন্দ্র বোস বইতে দাবি করছেন, নাজিরা ফ্রিডাকে সুভাষের দলে গুপ্তচরগিরি করতে পাঠিয়েছিল। নেতাজীর সঙ্গী হওয়ার সুবাদে ফ্রিডার সঙ্গে গান্ধীবাদী, নাজি বিরোধী জাতীয়তাবাদী, প্যারিসে হিন্দুস্তান টাইমসের সাংবাদিক গিরিজা মুখার্জীর আলাপ। নাজিরা গিরিজা মুখার্জীকে জেলে পাঠিয়েছিল। সুভাষের নির্দেশে গিরিজা ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে কাজ করার সময় ফ্রিডার সঙ্গে আলাপ এবং প্রেম। যুদ্ধ শেষে বাদেন বাদেনে ফ্রিডা-গিরিজা মিলিত

হয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। দিল্লিতে ফিরে গিরিজা মুখার্জী বিদেশ দপ্তরে যোগ দেন।

ফ্রিডা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন প্রফুল্ল বিশ্বাসকে জার্মানির রাজনৈতিক ট্রেন্ড সম্বন্ধে অবহিত করেন। দুই নাজি-বন্ধুর তাত্ত্বিকতায় তৈরি হল এক ঝাঁক নৃতাত্ত্বিক আই পি সিংহ, এম কে ভাসিন, এইচ কে কুম্বনানি, পি দাশ শর্মা, পি কে ঘোষ, এস এল মালিক, কে কে মিত্র ইত্যাদি। এরা ভারতজোড়া বহু সংগঠনে নৃতাত্ত্বিকদের প্রশিক্ষণ দিলেন। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানিতে ছিলেন। হুদাকে আই পি সিং গর্বভরে বলেছেন তিনি 'conqueror's visa' [মানে কি?] নিয়ে ফিরেছেন।

তবে KWI-Aতে একাই প্রফুল্ল বিশ্বাস গবেষণা করেন নি, বিখ্যাত ইরাবতী কার্ভে এবং শশাঙ্ক শেখর সরকারও কাজ করেছেন, (২০২২এর এক প্রবন্ধে শুভাঞ্জন সরকার ড শশাঙ্ক শেখর সরকার - দ্য ডয়েন অব ইন্ডিয়ান এন্থ্রোপলজি প্রবন্ধে শশাঙ্ক শেখরের নাজি জার্মানির প্রবাস বর্ণনা এক লাইনে সেরেছেন)। ইরাবতী কার্ভের ওপর জার্মান প্রভাব বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে নন্দিনী দুন্দর ইন দ্য কজ অব এন্থ্রোপলজি - দ্য লাইফ এন্ড ওয়াক অব ইরাবতী কার্ভে প্রবন্ধে বলছেন, যদিও কার্ভে ফিশারের থেকে সুপ্রজনবিদ্যায় প্রভাবিত হন, কিন্তু জাতিতত্ত্ব তার কাজে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারে নি। হয়ত তাঁকে বাঁচিয়েছিল উপনিবেশিক পরিবেশ। অথচ থিয়াগো পিন্টো বারবোসা, রেসিয়ালাইজিং আ নিউ নেশন, জার্মান কলোনিয়ালিটি এন্ড এন্থ্রোপলজি ইন মহারাষ্ট্র, ইন্ডিয়া প্রবন্ধে বলছেন ইরাবতীর সঙ্গে জাতিবাদের জটিল সম্পর্ক তৈরি হয়; যত সময় গিয়েছে তিনি নিজেকে সামলেছেন। প্রজিতবিহারী মুখার্জী, ব্রাউন স্কিনস হোয়াইট কোটস রেস সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া ১৯২০-১৯৬৬ বইতে বলছেন, শশাঙ্ক শেখর সরকার বৈজ্ঞানিক জাতিবাদ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারেন নি, এবং তিনি বরাবরই সুপ্রজনবিদদের সঙ্গ করেছেন। যদিও প্রফুল্ল বিশ্বাসের মত প্রকাশ্যে কেউই নাজি রাজনীতি বা নাজি জ্ঞানতত্ত্বের প্রশংসা করতেন না, কিন্তু পরোক্ষে প্রায় প্রত্যেক নৃতত্ত্ববিদই জাতিবাদিতত্ত্বের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকেরা বরাবরই সুপ্রজননবিদ্যা বিষয়ে উতসাহী ছিলেন।

বিশ্ব সুপ্রজননবিদ্যা জাল

প্রফুল্ল বিশ্বাস নিজেকে বিশ্বসুপ্রজনন বিদ্যাচর্চার অংশ হিসেবে দেখতে ভালবাসতেন। ডারউইনের তুতোভাই আধুনিক সংখ্যাতাত্ত্ব, জিনতত্ত্ব, সাইকোমেট্রি, আঙুলের ছাপ বিদ্যা ইত্যাদির সূত্রপাত করা পণ্ডিত ফ্রান্সিস গ্যালটন, সুপ্রজনন বিদ্যার জনককেও অনুসরণ করেছেন। আমেরিকার সুপ্রজনবিদ্যার আন্দোলনেও প্রভাবিত হন।

বিশ্বসুপ্রজননবিদ্যার পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক জাল নিয়ে প্রফুল্ল বিশ্বাসের জ্ঞান আপতিক নয়। ১৯৩৫এ বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ফর পপুলেশন সায়েন্সেস। এই বিশাল সম্মিলন নাজি রাষ্ট্রের জাতিবিদ্বেষতত্ত্বকে সিলমোহর দিয়েছে।

ইউজিন ফিশার ছিলেন সম্মিলনের প্রেসিডেন্ট। যদিও প্রমান নেই, কিন্তু আশাকরা যায় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিন ফিশারের ছাত্র প্রফুল্ল বিশ্বাস এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সম্মেলনে আমেরিকিয় ক্ল্যারেন্স ক্যাম্পবেল আমেরিকার জাতিতাত্ত্বিকদের নাজি জাতিতত্ত্ব বিষয়ে আরও জানতে বুঝতে এগিয়ে আসতে বলেন। হিটলারের সঙ্গে ক্যাম্পবেলের টোস্টের ছবি আমেরিকার প্রধান সংবাদপত্রে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে। যুবা সুপ্রজনবিদ হিসেবে প্রফুল্ল বিশ্বাস সম্মেলনে ক্যাম্পবেলের সঙ্গে আলাপও করে থাকবেন।

প্রফুল্ল বিশ্বাস সারা জীবন এই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক আর জাতিবাদী আদর্শগত অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। নাজিদের প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন শুধুমাত্র কয়েক দিনের ফ্যাশান ছিল না। যদিও সুপ্রজনবিদ্যা নিয়ে তিনি নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান ১৯৩০এর দশকেই লিখেফেলেছেন, কিন্তু তিনি সারাজীবন বিশ্বজোড়া সুপ্রজননবিদ এবং জাতিবাদী পণ্ডিতদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে ম্যানকাইন্ড কোয়াটার্লির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সমাজতত্ত্ববিদ Stefan Kuhl লিখছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রগতিশীল আর ইহুদিদের ওপর গণহত্যা চাপানো আর ইহুদি বিরোধী জাতিবাদী হিস্টিরিয়া তৈরি করার অভিযোগে বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিক সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়ার পর International Association for the Advancement of Ethnology and Eugenics (IAAEE)এর সদস্যরা ম্যানকাইন্ড কোয়াটার্লি পত্রিকা নতুন করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে। পত্রিকা প্রকাশে পাইওনিয়ার ফান্ড থেকে অর্থ সাহায্য করেন আমেরিকিয় সুপ্রজনবিদ উইকলিফ ড্রেপার (Wickliffe Draper)। সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যাতে জাতিবিদ্বেষের অভিযোগ না ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে অইওরোপিয় প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাসকে সম্পাদকমণ্ডলীতে সামিল করা হয়। এরপর পরিকল্পিতভাবে Verschuerএর মত জার্মানদের পুনর্বাসসন দেওয়া হয়েছে সম্পাদকমণ্ডলীতে।

সিভিলিয়ান পিতা রায়বাহাদুর অভয়শঙ্কর গুহর পুত্র হারভার্ডে প্রখ্যাত সুপ্রজননবিদ ই এ হুতুনের ছাত্র এবং ভারতীয় নৃতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রতিষ্ঠাতা বিরজাশঙ্কর গুহর গুহ'র মৃত্যুর পরে স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে প্রফুল্ল জানান, বিরজা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে শংসাপত্র দিয়ে পাঠিয়ে ফিজিক্যাল এন্থ্রোপলজি মার্কা দপ্তর খোলার ব্যবস্থা করে দেন। প্রফুল্ল বিশ্বাসের দাবি বিরজাশঙ্কর গুহ যেমন সুপ্রজনবিদদের সঙ্গঠন International Association for the Advancement of Ethnology and Eugenics (IAAEE) প্রতিষ্ঠিত ম্যানকাইন্ড কোয়াটার্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জুড়েছিলেন, তেমনি নাজি নৃতত্ত্ববিদ Freiherr Egon von Eickstedtএর অর্থসাহায্যে চলা পত্রিকা হোমোর সঙ্গেও জুড়েছিলেন। তার ইঙ্গিত ছিল, বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিক সমাজে জাতিবাদিতার বিপুল প্রভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

পর বিন্দুমাত্র কমে নি, বরং সেটা আন্তর্জাতিকস্তরে ক্রমশঃ বাড়ছিল। ইওরোপিয়, আমেরিকিয় সুপ্রজননবিদেরা সঙ্গঠন তৈরি করে, সামনের সারিতে এক-দু'জন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিককে খাড়া করিয়ে রেখে নিজেদের আরও বেশি প্রগতিশীল হিসেবে তুলে ধরলেন। আমরা লুডউইগ এলসডর্ফকে লেখা বৈজয়ন্তী রায়ের প্রবন্ধে দেখব কীভাবে ডিনাজিফিকেশন প্রকল্পকে অকেজো করে অধিকাংশ নাজি অধ্যাপক যুদ্ধের পরে আপস মিমাংসায় পুনর্বাসনের পরিবেশ তৈরি করেন।

থার্ড রাইখের এন্থ্রোপলজি নিয়ে বই লেখা von Eickstedtএর ছাত্র, Ilse Schwidetzky আন্তর্জাতিকস্তরে তাঁর কাজকর্মের উদাহরণ দেখিয়ে নিজের নাজি অতীতের ওপর ঘোমটা টানার চেষ্টা করেছেন। Anthropologischer Anzeiger (নৃতাত্ত্বিক গেজেট) পত্রিকার ৪১ সংখ্যায় Ilse Schwidetzky, 'Short History of Indian-German Relations in Physical Anthropology' প্রবন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানিতে যাওয়া ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের উদাহরণ দিচ্ছেন, যাদের মধ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু নৃতাত্ত্বিকের নামও রয়েছে (After World War II, Indhera P. Singh, who followed later on Biswas in the chair in Delhi, studied two years in Frankfurt with Kramp and Breitinger, and V. P. Chopra came to Mainz and is now a German physical anthropologist. There had been also many Indians, who were awarded scholarships by the Humboldt-Stiftung or tthe Akademische Austauschdienst, for instance A. R. Banerjee, M. K. Bhasin, A. B. Das-Chaudhuri, M.R. Chakravartti, S.R.K. Chopra, B. Das, R.K. Gulati, H.K. Kumbnani, R. Ananthakrishnan,. German physical anthropologists and human genetists (e.g. G. Flatz, F. Vogel, H. Walter a. o.) contributed also to the education of Indian students by lectures and courses in Indian Universities.)। জাতিবাদী পাণ্ডিত্যের কাজকর্ম লুকোবার জন্যে ভারতীয় আর জার্মান নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক উপাত্ত আদান-প্রদানের উদাহরণকে গ্রান্ড ইতিহাসের রূপ দিচ্ছেন ইলসে। তাঁর এই বক্তব্য থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি কীভাবে জার্মান নৃতাত্ত্বিকেরা ভারতবর্ষীয় মাথার খুলি গবেষণার জন্যে জোগাড় করেছে এবং আরও বড় কথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে জার্মান সাম্রাজ্য যে ধরণের হিংসা চাপিয়ে দিয়েছে, বৈজ্ঞানিক জগৎ আজও সে সব কর্মকাণ্ডে নিজেদের দায়িত্ব, জড়িয়ে থাকার তথ্য হয় অস্বীকার করছে, নয়ত হাল্কা করে দেখাচ্ছে, কিছু না পারলে মরিয়া হয়ে জাতিবাদ আর হিংসাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার দোহাই দিয়ে বৈধতা দিচ্ছে।

উত্তরাধিকার

এখন প্রশ্ন হল, এই জাতিবাদীতার ইতিহাস দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বচর্চায় কতটা প্রভাব ফেলেছে। প্রফুল্ল বিশ্বাসের কাজকর্ম, লেখাপত্র থেকে পরিষ্কার, তাঁর জার্মান অভিজ্ঞতা নিজের বিভাগের জ্ঞানচর্চায় প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল। প্রবন্ধকারের ধারণা অন্য সংগঠনের ওপরেও প্রভাব কম পড়ে নি। আজও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবিক নৃতত্ত্ব চর্চায় ডার্মাটোগ্লাইফিসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই বিভাগে Certificate Programme in Forensic Science শুরু হওয়ার পর থেকে ডার্মাটোগ্লাইফিস চর্চার গুরুত্ব বেড়েছে। ডার্মাটোগ্লাইফিস চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়ার আরও একটা কারন হল, খুব কম দামি হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে গবেষণার কাজ চালানো যায়।

প্রফুল্ল বিশ্বাস এবং তাঁর ছাত্ররা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগকে জার্মান চরিত্রে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। নৃতত্ত্ব বিভাগের তাঁর দুই প্রভাবশালী ছাত্র আই পি সিংহ আর এম কে ভাসিনের এন্থ্রোপোমেট্রি বইএর সমালোচনায় এডওয়ার্ড হান্ট লিখলেন, 'সিংহ-ভাসিনের বই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা হলেও কাঠামো জার্মান জাতিবিদ্যা প্রভাবিত। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা পি সি বিশ্বাস বার্লিনে ইউজিন ফিশারের ছাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি দিল্লিতে জৈবিক নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনার কাঠামো তৈরি করেন - তাদের বইতে স্পষ্টই মার্টিন-সালারএর Lehrbuchএর কিছু অংশ ধার নিয়েছে ... কিছু ... ত্রুটি তৈরি হয়েছে জার্মান অর্থোগ্রাফির অনুমানের জন্যে।'

প্রফুল্ল বিশ্বাসের সুপ্রজনন বিদ্যায় গভীর বিশ্বাসের প্রভাব আমরা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণভাবে ভারতজোড়া নৃতত্ত্বিক কাজে দেখি। Sarah Hodges এর সম্পাদনায় Reproductive Health in India: History, Politics, Controversies, তাঁরই, 'Indian Eugenics in an Age of Reform' প্রবন্ধে দেখছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময়েও নাজি নৃতাত্ত্বিকদের ব্রিটিশ, আমেরিকিয় নৃতাত্ত্বিকেরা যথেষ্ট সম্মান করতেন। বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক সুপ্রজনবিদ্যা আন্দোলনকে নানাভাবে বৈধতা দিয়েছে। ফিশারের গবেষণা সঙ্গঠনে রকফেলারদের বিপুল অর্থসাহায্যের কথা আগেই আলোচনা করেছি। Gretchen Schafftএর বইএর শীর্ষক From Racism to Genocide থেকে পরিষ্কার ইউজেনিক্স বা গণহত্যা আজও 'জাতিবিজ্ঞান'এর গায়ে দগদগে ঘায় হয়ে জুড়ে থাকবে। মাথায় রাখা দরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই অধিকাংশ নাজি নৃতত্ত্ববিদ কেরিয়ার বাঁচাতে নাজিতত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু শ্যাফট বলছেন, [নাজি রাষ্ট্রে] জাতিবাদী সিদ্ধান্তে ব্যাপকভাবে অংশ এবং গণহত্যায় তাদের ভূমিকা নিয়ে নৃতাত্ত্বিকদের নীরবতা লক্ষ্যণীয়। এন্থ্রোপোমেট্রি পাঠ্য বইএর হান্টের যে সমালোচনা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেই প্রবন্ধে তিনি ফিশারকে এন্থ্রোপমেট্রি গবেষণায় ভ্যানগার্ড বলছেন, যা আদতে ফিশার আর

ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্মের বৈধতা দিচ্ছে এবং এন্থ্রোপমেট্রির মত খুবই সমস্যাজনক হাতিয়ার ব্যবহার করে যে সব খারাপ কাজ করা হয়েছে, সে সবগুলোকেও অস্বীকার করা হচ্ছে।

আজকেও নৃতাত্ত্বিকেরা হয়ত নাজি সুপ্রজননবিদ্যাকে নিন্দা করেন - এবং নিজেদের নৃতাত্ত্বিক আখ্যা না দিয়ে শুধুই সুপ্রজননবিদ বলেন। আমেরিকিয় নৃতাত্ত্বিকেদের দাবি তারা ফ্রাঞ্জ বোয়ার (Franz Boas) জার্মানজাত জাতিবিদ্বেষী জ্ঞানচর্চার পরম্পরা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু ইন্টারেস্টিং হল নৃতাত্ত্বিক Ales Hrdlicka অনুপ্রবেশকারী রুখতে এবং আমেরিকিয় বংশের রক্ত মিশ্রণের বিরুদ্ধে ('diluting of … [America's] "base stock"') আমেরিকিয় রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের নীতির সঙ্গী হন।

এই আলোচনায় পরিষ্কার প্রফুল্ল বিশ্বাসের নাম নৃতাত্ত্বিক হিসেবে তার দেশ, যে শহর ভুলেছে। হয়ত এটাই স্বাভাবিক। তাঁকে আর স্মরণ করার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তিনি যে বিভাগে কাজ করে জাতিবাদী তত্ত্বের ভিত তৈরি করেন তার অনুগামীদের মাধ্যমে, সেই তত্ত্ব ফলেফুলে বিকশিত হয়ে আজ স্বাভাবিক পণ্ডিতি তত্ত্ব হিসেবে নানানরূপে বৈধতা পাচ্ছে।

প্রজিতবিহারী মুখার্জী, মধ্য বিংশ শতক থেকে ভারতে রক্ত বিশ্লেষণ করে তার শ্রেণীবিভাগ করার সেরো-এন্থ্রোপলজ sero-anthropologyর উদ্যম নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেরো-এন্থ্রোপলজি বিকশিত হয়েছে পোলিশ Hirszfelds স্বামী-স্ত্রীর তৈরি তত্ত্বে, যাদের দাবি রক্তের A বা B শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে জাতিভাগ করা সম্ভব – তারা বললেন A টাইপ মূলত ব্রিটিশ আর B শ্রেণীরা মূলত ভারতীয়। ভারতে এই তত্ত্ব নিয়ে নৃতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন সমাজের শ্রেণী বিভাগ করার পরিকল্পনা করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাতি শব্দটা এতই ঘৃণিত ছিল যে নৃতাত্ত্বিকেরা জাতির জায়গায় জনগণ ব্যবহার করলেন, কিন্তু জাতিবাদিতার বদবু লুকোনো গেল না। ১৯৪৭এর পরে পরিকল্পনা দপ্তরের বিজ্ঞানচর্চায় বিপুল বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জৈবিক নৃতত্ত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল, বৈধতাও অর্জন করল। মাথায় রাখতে হবে রাষ্ট্রীয়স্তরে বিপুল প্রভাবশালী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ব্রিটিশ সংখ্যাবিদ-নৃতাত্ত্বিক ফ্রান্সিস গালটন আর কার্ল পিয়ার্সনের অনুগামী ছিলেন। Projit Mukharji, 'From Serosocial to Sanguinary Identities: Caste, Transnational Race Science and the Shifting Metonymies of Blood Group B, India c. 1918–1960 প্রবন্ধে বলছেন, কীভাবে জৈবিক নৃতাত্ত্বিকেরা প্রশান্ত মহলানবিশের সঙ্গে মিলে ভারতীয়দের জাতিতাত্ত্বিক জৈবিক শ্রেণীবিভাগ করলেন। রাজ্যের সীমান্ত আঁকায় এই কাজ বিপুল প্রভাব ফেলেছে।

যদিও প্রজিতবিহারী প্রফুল্ল বিশ্বাস বা তার পণ্ডিতি পরম্পরা নিয়ে কাজ করেন

নি, কিন্তু প্রজিত প্রফুল্ল বিশ্বাসের ছাত্র বা নৃতাত্ত্বিক সহকর্মীদের আলোচনায় এনেছেন। প্রজিত দেখান কীভাবে মানুষের শ্রেণী বিভাগ করার সময় বিজেন্দর ভাল্লার মত নৃতাত্ত্বিকের মত নেওয়া হয়। ভাল্লার বক্তব্য ছিল জাতিরা যেহেতু 'সামাজ বিচ্ছিন্ন' ('social isolates') এবং তারা নিজেদের নিজস্ব গোষ্ঠীর বাইরে প্রজনন করে না এবং তাই তাদের জৈবিকভাবে স্বতন্ত্র 'জনগণ/জনসংখ্যা' হিসাবে দেখা হোক। এখানে এটা তথ্য দেওয়া যাক, প্রফুল্ল বিশ্বাসের সরাসরি ছাত্র ভাল্লা চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। যদিও জাতির মধ্যে অন্তঃবিবাহের তত্ত্ব খুব একটা টেকেনি কিন্তু হোদা বলছেন, মাঠ কাজে তিনি এই তত্ত্বের মুখোমুখি হয়েছেন। যদিও নৃতাত্ত্বিকেরা বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়াই, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েও মনে করেন বহু সামাজিক গোষ্ঠী জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। সেরো-এন্থ্রোপলজি নিয়ে গবেষণায় দিল্লি আর চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠল phenylthiocarbamide (PTC) পরীক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। প্রজিতবিহারী বলছেন, পি কে শেঠ বিভিন্ন কাস্ট গ্রুপে যেমন PTCর পরীক্ষা করেছেন, তেমনি ডি কে [দিব্যেন্দুকান্তি] ভট্টাচার্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী এংলো ইন্ডিয়ানদের ব্রিটিশত্ব আর ভারতীয়ত্ব নির্ধারণ করেছেন। দুজনই প্রফুল্ল বিশ্বাসের ছাত্র [কিন্তু অভীক ঘোষ ইন্ডিয়ান এন্থ্রোপলজিস্ট পত্রিকায় ২০১৮য় যে প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধে সযত্নে প্রফুল্ল বিশ্বাসের নাম এড়িয়ে যান। প্রবন্ধ পড়ে বোঝা যায় না, দিব্যেন্দুকান্তি, প্রফুল্ল বিশ্বাসের ছাত্র ছিলেন, তাঁর সুপারিশে চাকরি পেয়েছেন। হোদা জানাচ্ছেন দিব্যেন্দুকান্তি ভট্টাচার্য তাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা পুরোহিত, সংস্কৃত শিক্ষক। প্রফুল্লবাবু তাঁকে ডাকিয়েছিলেন বিবাহযোগ্যা তিন কন্যার ঠিকুজি মেলাতে। সেই যোগাযোগে দিব্যেন্দুকান্তির দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ]।

ভারতে জাতিবাদী 'বিজ্ঞান'এর ধারাবাহিকতার আরেকটি দিক হল অমানবিকতা। প্রজিতবিহারী দুটো ভয়াবহ উদাহরণ দিচ্ছেন। সিরিও-এন্থ্রোপলজিস্টরা জারোয়া বাচ্চাকে গবেষোণার উপাত্ত হিসেবে অন্তরীণ রেখে উত্তেজিত করে বিশুদ্ধ রক্ত স্টাডি করেছেন। আর মালে দেশের এক সমাধিক্ষেত্রে শশাঙ্ক শেখর সরকার এক পরম্পরার সমাজের উত্তেজিত জনসমাজ, কান্নায় ভেঙ্গে পড়া কন্যার সামনেই সমাধিক্ষেত্র থেকে সমাধিস্থর মাথার খুলি তোলেন। জোর করে রক্ত জোগাড় করার বহু উদাহরণ প্রজিতবিহারী উল্লেখ করেছেন। প্রফুল্ল বিশ্বাসের ছাত্র, ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের কর্মী নরেন্দ্র কুমারের লেখা উল্লেখ করে প্রজিতবিহারী জানাছেন, নরেন্দ্র মনে করতেন অনুমতি নিয়ে আঙুলের ডগা থেকে রক্তের নমুনা নেওয়া প্রভূত ঝামেলা। বহু নৃতাত্ত্বিক, চিকিৎসকের ছদ্মবেশে বা পরম্পরার চিকিৎসার বাহানায় রক্তের নমুনা সংগ্রহ করতেন। তাই প্রথম দিককার নৃতাত্ত্বিকেরা, যে সব মানুষের সঙ্গে কাজ করতে সাধারণত অনুমতি প্রয়োজন হয় না যেমন রোগী, বন্দী, চা বাগানের

শ্রমিক ইত্যাদিদের থেকে নমুনা সংগ্রহ করতেন। জ্ঞানার্জনের কাজে নৃতাত্ত্বিকেরা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাকে বরাবরই ব্যবহার করেছেন।

প্রফুল্ল বিশ্বাসের দুই ছাত্র A.K. Kalla, D.K. Bhattacharya সম্পাদিত Understanding People of India: Anthropological Insight: Proceedings of the P.C. Biswas Centenary National Seminar বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৩এ। প্রফুল্ল বিশ্বাসকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তাঁর দুই ছাত্র তাঁর হামবোল্ট জলপানি, বিদেশি ডিগ্রি এবং নৃতাত্ত্বিকদের প্রশিক্ষণে উজ্জ্বল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা শুধু একবারই নাজি জার্মানির সঙ্গে তাদের শিক্ষকের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে বলছেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মরফোজেনারিক ভেরিয়েবিলিটি নিয়ে কাজ করা অধ্যাপক ইউজিন ফিশার অনুপ্রেরণামূলক পথনির্দেশে কাজ করেছেন।' মাথায় রাখতে হবে প্রফুল্ল বিশ্বাসদের নির্দেশনায় যেসব ছাত্র জাতির শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তারা যখন তার শিক্ষকের [নাজি] শিক্ষকের অবদান কম্বুকণ্ঠে উল্লেখ করেন, আমরা ধরে নিতে পারি তারাও নাজি তত্ত্বে প্রভাবিত হয়েছেন।

সিদ্ধান্ত

নাজিদের সঙ্গে কাজ করা বা রাজনৈতিকভাবে নাজিপন্থী শিক্ষক একা প্রফুল্ল বিশ্বাস নন। তিনি একাই নাজি সুপ্রজনবিদ্যা সঙ্গঠনে কাজ করেছেন এমনও নয়। বহু বিখ্যত তাত্ত্বিক যেমন ইরাবতী কার্ভেও তাঁর মতই সরাসরি মিউনিখের কাইজার উইলহেল্ম ইন্সটিটিউটে ইউজিন ফিশারের অধীনে গবেষণা করেছেন। আমরা দেখেছি কলকাতায় থাকা বিনয় সরকারও নাজিদের সঙ্গে কাজ করেছেন, নাজি জার্মানিতে পড়িয়েছেন। ব্রিটিশদের অভিযোগ বিনয় সরকারকে নাজি রাষ্ট্র অর্থ সাহায্য করেছে। প্রফুল্ল বিশ্বাস বার্লিনে পড়া শেষ করে কলকাতায় ফিরে সর্বপ্রথম অর্থনীতির শিক্ষক বিনয় সরকারের বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদের সদস্য ছিলেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ সূত্রে দেখলাম তাঁর সঙ্গে কাজ করা সহকর্মী বা আজকের ভারতের বড় অংশের প্রবীণ নৃতত্ত্ববিদ প্রফুল্ল বিশ্বসের ছাত্র। তারা অনেকেই শিক্ষকের নাজি ইতিহাস নিয়েও গর্বিত। তারা তাঁর প্রণীত বৈজ্ঞানিক জাতিতত্ত্ববাদ নির্ভর গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তাকে বৈধতা দিয়েছেন নানাভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায়।

মুখবন্ধেই আমরা থিয়াগো পিন্টো বারবোসার প্রশ্ন তুলেছি কোরিয়া, চিন, ভেনিজুয়েলা, ভারতবর্ষ থেকে প্রফুল্ল বিশ্বাস অথবা ইরাবতী কার্ভের মত অসাদা, অইওরোপিয় ছাত্রদল, সেই সব ক্লেদাক্ত ইন্সটিটিউশনে পাঠ নিতে আসছে কেন? কেন সেই সময়ে এবং ক্ষেত্রে জারিত মূলধারার তত্ত্বগুলিতে জাতিগতভাবে নিকৃষ্ট দাগিয়ে দেওয়া গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা KWI-A-তে জাতি এবং সুপ্রজনবিদ্যা সম্পর্কে জানতে এবং গবেষণা করতে চাইছেন? কি ধরনের জ্ঞান তারা তৈরি করছে, বা নতুন করে

বিকাশ ঘটাচ্ছেন? তারা কি সাদা সহকর্মী এবং পরামর্শদাতাদের থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন? তারা কি তাদের অধ্যাপকদের বর্ণবাদী পক্ষপাতকে অস্বীকার করেছেন, না কী সেই সব জাতিগত তত্ত্বকে নিজের জীবনে মানিয়ে নিয়েছেন?

আন্দাজ করতে পারি, কীভাবে নাজি রাজনীতির উত্থানের পর থেকে দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে অজার্মান বৌদ্ধিকেরা নাজি জাতিবাদী রাজনীতিতে ব্যবহৃত বৌদ্ধিক জাতিবিদ্বেষ তত্ত্বকে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের জাতিবিদ্বেষী রাজনীতির খাদ্য হিসেবে জাগিয়ে রেখেছেন এবং এই প্রবণতা আজকের ভারতে দগদগে ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। মাথায় রাখতে হবে জাত ধর্ম নির্বিশেষে অব্রাহ্মণ প্রফুল্ল বিশ্বাস বা চিতপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ইরাবতী কার্ভের ৯০ বছর আগের গবেষণা তত্ত্ব এবং গবেষণা প্রকরণ আজকেও পরোক্ষে সঙ্ঘ পরিবারের বিভেদ তৈরির রাজনীতিকে বাস্তবে জাগিয়ে রাখছে। জার্মানিতে ডিনাজিফিকেশন পরীক্ষানিরীক্ষা চরম ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্ঘ পরিবারের প্রত্যেকটি জাতিবাদী কাজের বিরুদ্ধচারণ করতে সঙ্ঘ পরিবারের তাত্ত্বিক ভিত্তির জনক নাজি আর ফ্যাসিবাদী রাজনীতি এবং নাজি কোলাবরেটরদের কাজকর্ম নতুন করে চিহ্নিত করতে হবে। তবেই আমরা এই তত্ত্বের এন্টিডোট খুঁজে পাব।

প্রবন্ধ সূত্র Hoda Bandeh-Ahmadi, The Bad Stock: Nazi Eugenics and the Growth of Anthropology in Delhi

অন্য ইরাবতী কার্ভে
রেস তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা
থিয়াগো পিন্টো বারবোসা

মারাঠি নৃতাত্ত্বিক ইরাবতী কার্ভে ভূতত্ত্ববিশ্বে 'race' ধারণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চর্চক। ১৯২৯-৩০এ Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenicsএ, তিনি 'জাতি মিশ্রণ' তত্ত্বের প্রধান তাত্ত্বিক ইউজিন ফিশারের নির্দেশে জাতি পার্থক্য নির্ধারণ করতে মানুষের মাথার খুলির মাপ নিয়ে গবেষণা করেন। আজকের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইরাবতীর The normal asymmetry of the human skull গবেষণাটি KWI-Aর একমাত্র কাজ যা সে সময়ের জাতিবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেছে। গবেষণা শেষে ১৯৩০এর দশকে ভারতবর্ষে ফিরে মহারাষ্ট্রের ডেকান কলেজে অধ্যাপনার জীবন শুরু করেন। যদিও ইরাবতী কার্ভের খ্যাতি সামাজিক, কৃষ্টিমূলক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার কাজের জন্যে, কিন্তু তাঁর জৈবিক নৃতত্ত্ব বা population genetics এর কাজ অনালোচিত। স্বাধীনতা, আর্য অভিবাসন তত্ত্ব এবং এই ধরণের বহু বিতর্কে ইরাবতী দক্ষিণ এশিয়ার নানান সামাজিক গোষ্ঠীর বৈচিত্র এবং অভিন্নতার যুক্তিগুলো তুলে ধরেন, যে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত জাতিবাদী নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানে রূপান্তরিত হয় এবং সেই জ্ঞান নানান জাতি, আদিবাসী এবং ধর্মের বৈচিত্রের চরিত্র নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৪৭এর আশেপাশের সময়ে জার্মান গবেষণা নির্দেশক ফিশারের সুপ্রজনবিদ্যার সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। সেই সময় তাঁকে কঠোর হিন্দু জাতীয়তাবাদী রূপে দেখি। সঙ্ঘ পরিবারের তত্ত্বের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনি ভারতীয় মুসলমান এবং খ্রিশ্চানদের আলাদা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে দেগে দিচ্ছেন, ভারতীয় সমাজে মিশে যেতে না পারা গোষ্ঠী হিসেবে দাগিয়ে দিচ্ছেন। দেশভাগের মুখে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় মুসলমানরা 'জাতিগত দ্বন্দ্বে'র পরিবেশ তৈরি করেছে। নন্দিনী সুন্দর বলছেন সেই মুহূর্তে স্পষ্টভাবে হয়ত তার মহারাষ্ট্রীয় চিতপাবন ব্রাহ্মণ সত্ত্বাটা বড়ভাবে প্রকাশ্যে ফুটে উঠছিল।

জার্মান বৈজ্ঞানিক বিশ্বে, Rasse শুধুমাত্র নৃবিজ্ঞান চর্চারই কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল এমন নয়, মানুষ নিয়ে কাজ করা প্রতিটা জ্ঞানচর্চায় এই ধারণাকে অবাধে ব্যবহার করা হয়েছে। ইওরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গীতে race, জাতির প্রেক্ষিতে মানুষদের গোষ্ঠীতে ভাগ করার জ্ঞানচর্চা চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছল নাজি জার্মানি রাষ্ট্র, জাতিবাদী তাত্ত্বিকদের প্ররোচনায় সুপ্রজননবিদ্যা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কিছু সমাজের ওপর গণহত্যা নামিয়ে আনার মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়ে নাজি রাষ্ট্র ধ্বংস হলেও, raceএর ধারণা বিশাল প্রশ্ন চিহ্নের সামনে পড়লেও, রেস বা জাতির ধারণা আজ সামাজিক বিষয় হিসেবেই তার প্রভাব নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার শাখাতেও আরও বেশি বেশি করে ছড়িয়েছে।

নৃতত্ত্ব, পরে যার একাংশ জৈবিক নৃতত্ত্ব হিসেবে আলাদা হয়ে যাবে, 'জাতি'র ধারণা তৈরিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ইওরোপিয় উপনিবেশবাদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকতার সূত্রে যখন উপনিবেশিক প্রশাসকেরা উপনিবেশের জনগণের বৈচিত্র বুঝতে শুরু করলেন, বিশেষ করে উনবিংশ শতের শেষের দিকে, সেই সুবাদে নৃতত্ত্ব আলাদা জ্ঞানচর্চা হিসেবে প্রাধান্য পেল। জৈবিক নৃতাত্ত্বিকেরা মানুষের জাতিগত বৈচিত্র নির্ধারণ করোতে বৈশ্বিকভাবে জাতির ধারণাকে boundary object হিসেবে ব্যবহার করলেন যাতে জীববিজ্ঞান এবং অন্য প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানচর্চার

সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলাপচারিতা শুরু করা যায়। উপনিবেশক পথ নির্ভর করে মাঠকর্মজাত উপাত্ত, প্রত্নবস্তু, মনুষদেহের অংশ এবং অন্য জাগতিক জিনিসপত্র সংগ্রহ করে কেন্দ্রিয়ভাবে গবেষণা করার জন্যে মেট্রোপলিটনে বয়ে আনার কাজে জৈবিক নৃতাত্ত্বিকেরা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের নামে বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। এই বিশ্ব চলাচলের বিশ্ব নেটওয়ার্কের কেন্দ্রে রয়েছে বেশ কয়েকটা ইন্সটিটিউশন, যেখানে কাজ করেন এক দল বৈজ্ঞানিক। তারা বিশ্বজোড়া সংগৃহিত বস্তু বিশ্লেষণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং জাতিতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকতার মোড়ক দিয়ে জনমানসে বৈধতা দান করেন।

বিংশ শতকে জাতি বিশ্লেষণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটিটিশন হয়ে উঠেছিল নাজি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics যাকে আমরা এই প্রবন্ধে নামে অভিহিত করব KWI-A। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সঙ্গে ধনকুবেরদের দানে বার্লিনে প্রযুক্তিগত, মনুষ্য এবং আর্কাইভ্যাল রিসোর্সের বিশাল কাঠামো গড়ে ওঠে। প্রযুক্তির দিক থেকে KWI-A এন্থ্রোপোমেট্রির মত নানান ধরণের প্রযুক্তিগত হাতিয়ার জোগাড় করে, তৈরি করে। দৈহিক মাপ নেওয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করে, মাথার খুলি বা দেহের মাপ নেওয়ার পদ্ধতির প্রমিতিকরণ করে। বন্ধু, সঙ্গঠন প্রধান ইউজিন ফিশার সম্মতিক্রমে KWI-Aর অধ্যাপক রুডলফ মার্টিন দুটি যন্ত্র তৈরি করেন - cubic craniophor (মানুষের মাথার খুলির পরিমাপের জন্য), the anthropometer (শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিমাপের জন্য)। ইন্সটিটিউটের ছাত্র ইরাবতী কার্ভে গবেষণায় যন্ত্রগুলি ব্যবহার করেছেন। আজও এই যন্ত্র ইন্সটিটিউট থেকে কেনা যায়, বিশ্বজোড়া জৈবিক নৃতত্ত্ব, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারের ব্যবহারও হয়। ভারতে দিল্লি আর পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রের নমুনা আছে। আজও জৈবিক নৃতাত্ত্বিকেরা প্রাথমিকভাবে এন্থ্রোপোমিটার ব্যবহার করেন। KWI-Aতে রাখা বিপুল পরিমান মানুষের দেহাবশেষের পরিমাপ নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল 'জাতি'ভেদ নিয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উৎপাদন নিশ্চিত করা – ইন্সটিটিউটের ছাদের ঘরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জোগাড় করা ৫০০০ খুলি, কঙ্কাল, মনুষ্য দেহাবশেষ গবেষণার কাজে সাহায্য করার জন্যে রাখা ছিল। সংগ্রহটির প্রাতিষ্ঠানিক নাম S-Sammlung – শুরু করেছিলেন বার্লিনের এথনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের নৃতাত্ত্বিক Felix von Luschan। সংগ্রহটা ১৯২৮ থেকে কিছু বছর KWI-Aতে ধার হিসেবে থেকে Friedrich Wilhelm Universityতে, ১৯৪৯ থেকে নতুন নামকরণ হয় বার্লিনের হামবোল্ট ইউনিভার্সিটি। সেখানে এই সংগ্রহ রাখা আছে। সব খুলি, কঙ্কাল, মনুষ্য দেহাবশেষ এসেছে বিশ্বের বহু অঞ্চল থেকে বিশেষত আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়ার জার্মান উপনিবেশ থেকে। ৩০টা নামিবিয়ার জার্মান উপনিবেশের।

বিশ্বজোড়া দেহাবশেষ নিয়ে KWI-Aর আন্তর্জাতিক গবেষক দল, মানুষের

গোষ্ঠীর জাতিগত পার্থক্য তৈরি করে 'জাতি'-র সাধারণ ধারণা তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইন্সটিটিউটে বিকশিত জ্ঞান বার্লিন্স ইন্সটিটিউটে গবেষণা করা আন্তর্জাতিক গবেষকদের মাধ্যমে বিভিন্ন রূপ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় KWI-Aতে প্রায় ১২জন জার্মান আর ৩৪জন আন্তর্জাতিক জাতিতত্ত্ব গবেষকের মধ্যে তিনজন ভারতবর্ষীয় - তার মধ্যে একজন আঙুলের ছাপ নিয়ে কাজ করা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগ শুরু করা প্রফুল্ল বিশ্বাস অন্যজন প্রখ্যাত ইরাবতী কার্ভে।

স্বামী দিনকর কার্ভের সঙ্গে ইরাবতীও জার্মানিতে গবেষণা করতে আসেন ১৯২৮এ। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০এর মধ্যে তিনি KWI-Aতে মাথার খুলি পার্থক্য এবং জাতিগত বিভেদ নিয়ে কাজ করেছেন। গবেষণা শেষে ইরাবতী কার্ভেই নাজি জার্মানির হয়ত একমাত্র ব্যতিক্রমী ছাত্র, যিনি গবেষণা শেষে বলতে পেরেছিলেন মাথার খুলি গবেষণায় জাতিগত পার্থক্য পান নি। থিয়াগো ইরাবতীর গবেষণা বি লিখছেন, Karvé's PhD thesis was titled The normal asymmetry of the human skull. ...Yet, interestingly, Karvé summarises her research results by claiming that '[…] there exist no frequency differences between [the three analysed groups], not even racial differences' she was probably the only researcher there who claimed to not have found evidence of the existence of racial differences। মাথায় রাখতে হবে ইরাবতী ভারতবর্ষে চলে আসার পরে KWI-A তাঁর গবেষণার সিদ্ধান্তের উলটোপথে অর্থাৎ জাতিগত বিভেদ নিশ্চিত করার পথে যাত্রা শুরু করবে এবং বেশ কিছু গবেষকের উদ্যমে বিভেদ তত্ত্ব ক্রমশ নাজি দলের কমসূচীতে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠে সাদা চামড়ার মানুষদের নির্দিষ্ট কিছু জাতিগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনার বৈধতা তৈরি করার রাস্তা করে দেবে।

১৯৩১এ প্রকাশিত ইরাবতীর গবেষণা craniometric researchএর সীমাবদ্ধতার জলজ্যান্ত নিদর্শন হয়ে আছে। বিংশ শতাব্দে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে phrenology গবেষণা বৈধতা হারালে, পদ্ধতি হিসেবেও craniometry বৈধতা হারায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইরাবতীর গবেষণা নির্দেশক ইউজিন ফিশার, আত্মকথায় বারবার KWI-A-এর craniometric researchএর সংখ্যা আর গুরুত্ব কম করে দেখিয়েছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণ (ভুল) ধারণা আছে যে নৃতত্ত্ববিদেরা মূলত মাথার খুলিরই পরিমাপ করেন। ফিশারের দাবি তিনি KWI-Aতে অতিরিক্ত craniometric researchএর কাজে নিরুৎসাহ করেছেন। একই সঙ্গে দাবি করছেন, তিনি যেহেতু মোট ১০টা গবেষণা প্রকল্প দেখাশোনা করতেন, তাই তার পক্ষে সব কটা গবেষণা খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব ছিল না।

ইরাবতীর The normal asymmetry of the human skull গবেষণাটি KWI-Aর একমাত্র কাজ যা সে সময়ের জাতিবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেছে। ইওরোপিয় সংখ্যাধিক্যের গবেষকদের মধ্যে ইরাবতী ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ অইওরোপিয়। পাদটিকায় লিখছেন, 'লেখক স্পষ্ট মনে রেখেছে কিভাবে জার্মান এবং ইংরেজ নির্দেশকরা আদিম মানুষের প্রতিষ্ঠান এবং তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের তুলনা করতে অস্বীকার করেছে। প্রতিবার বয়সে অনেক ছোট গবেষক হিসেবে লেখক যে সব পরামর্শ দিয়েছেন, সে সবকে ঝেঁটিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা নিজের চিন্তাভাবনাকে মনের মধ্যে ধরে রাখাতে শিখিয়েছে।'

ইরাবতীর জার্মানি থেকে ভারতবর্ষে ফিরে মহারাষ্ট্রে জৈবিক নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করলেও জাতিতত্ত্বকে অন্যভাবে ব্যবহার করবেন।

মহারাষ্ট্রে চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকে ইরাবতীর জৈবিক নৃতাত্ত্বিক কাজ

ভারতবর্ষে ফেরার বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৩৯এ ইরাবতী ডেকান কলেজে যোগ দেন, আমৃত্যু ১৯৭০ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ১০০টার ওপর বই, গবেষণাপত্র লিখেছেন, প্রখ্যাত হয়েছেন। এক দিকে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক উদ্ভব তত্ত্বের নৃতাত্ত্বিক উত্তর খুঁজেছেন, অন্যদিকে জাতীয়স্তরে সামাজিক আর জাতীয় সংহতি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন - যেমন The biological basis of human society বা Indian sociology নিয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম তৈরি করিয়েছেন তেমনি অন্তত ২৫ জন PhD গবেষককে জৈবিক নৃতত্ত্বে গবেষণাও করিয়েছেন। শেষের দিকে জৈবিক নৃতত্ত্বকে জেনেটিক স্টাডি বলছেন। অনেকেই ইরাবতীকে মনে রেখেছেন আন্তঃবিবাহ করা caste-cluster জাতিগোষ্ঠী আর আদিবাসীদের নিয়ে জিন গবেষণা সূত্রে। caste-clusterএর জিনগত বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক আর পদ্ধতি আজও গবেষকেরা অনুসরণ করেন। এইভাবে তাঁকে আমরা নৃতত্ত্ব জ্ঞানচর্চায় জিন তত্ত্ব ব্যবহার করার অন্যতম অগ্রপথিক বলতে পারি।

তবে KWI-Aতে জৈবিক নৃতত্ত্ব প্রশিক্ষণের শিক্ষাকে ভারতে গবেষণার কাজে লাগানোর উদাহরণ ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় (উপ)জাতি এবং জাতিগোষ্ঠী নিয়ে কাজকর্ম। ইরাবতীর প্রথম জীবনের ভাবনাচিন্তায়, বিশেষ করে ১৯৪৭এর আশেপাশের সময়ে জার্মান গবেষণা নির্দেশক ফিশারের সুপ্রজনবিদ্যার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখি। সেই সময় তিনি কঠোর হিন্দু জাতীয়তাবাদী। সঙ্ঘ পরিবারের তত্ত্বের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভারতীয় মুসলমান এবং খ্রিশ্চানদের আলাদা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে দেগে দিচ্ছেন, ভারতীয় সমাজে মিশে যেতে না পারা গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করছেন। দেশভাগের মুখে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় মুসলমানরা 'জাতিগত দ্বন্দ্বে'র পরিবেশ তৈরি করেছে। নন্দিনী সুন্দর বলছেন সেই মুহূর্তে হয়ত তার মহারাষ্ট্রীয়

চিতপাবন ব্রাহ্মণ সত্ত্বাটা বড়ভাবে ফুটে উঠেছিল।

জাতি বিষয়ে ইরাবতীর অবস্থান বুঝতে ১৯৪০, ১৯৫০এর দশকে তাঁর গবেষণায় anthropometric পদ্ধতি প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক দাবিগুলো জানা দরকার। ১৯৫১য় সংখ্যাতাত্ত্বিক দিনকরের সঙ্গে ১১ বছরের গবেষণার Anthropometric measurements of the Maharashtra যৌথ প্রকাশনায় উভয়েই জাতিগত অভিবাসনের ফলে উদ্ভুত জাতিগত মিশ্রণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে anthropometric পদ্ধতি প্রয়োগ করার পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে বলছেন ইওরোপিয় নৃতাত্ত্বিকেরা ইওরোপে জাতি গবেষণায় anthropometric পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। যদিও তারা বইতে কাস্ট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, কিন্তু তারা বইতে রেস শব্দ ব্যবহার করেও সেই বিষয়টাকে তারা কীভাবে দেখছেন, তার ব্যাখ্যা দেন নি - তারা ধরেই নিয়েছেন বিষয়টা সকলেই বুঝবেন।

ইরাবতী-দিনকর কয়েকটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে receএর বিশেষণ হিসেবে racial শব্দ আখছার ব্যবহার করেছেন। বইতে যে ১৯টা আলাদা আলাদা সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের হয় কাস্ট, না হয় সাবকাস্ট, না হয় ট্রাইব বলেছেন। ইরাবতীর বার্লিনে বিকশিত এন্থ্রোপমিটার ব্যবহার করে প্রত্যেক ভারতীয় গোষ্ঠীর মানুষের দেহের মাপ অনুযায়ী চামড়ার রং, চোখের রং, নাকের আকার, চুলের আকার ইত্যাদি লিপিবদ্ধ, করেছেন। সঙ্গে জুড়েছেন সেই গোষ্ঠীর ভূগোল, কৃষ্টি এবং সামাজিক সংগঠনও। দিনকর-ইরাবতী কয়েকটি 'নিম্নজাতের' গোষ্ঠী বর্ণনায় মদে অত্যধিক আসক্তি, ফুর্তিতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের বর্ণনা লিখেছেন। আমরা দেখলাম anthropometric পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি যে সব তত্ত্ব তৈরি করছেন, সে সব কখনও না কখনও racialised হয়ে ওঠে।

Anthropometric উপাত্তগুলো সংখ্যাতত্ত্ব প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করে ইরাবতী আর দিনকরের বইতে তুলে ধরা হয়েছে। গোষ্ঠীগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করতে বিপুল সংখ্যায় তালিকা, লেখচিত্র বইতে জুড়েছেন। বইএর অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়ে আছে তালিকা আর লেখচিত্র। জাতিবাদী আলোচনাকে উপস্থাপন করেছেন সংখ্যাতত্ত্বের ঘোমটায়। আর্য অভিবাসন তত্ত্ব আলোচনায় লেখকেরা পরস্পর বিরোধী বাক্যে প্রথমে জানালেন আলোচ্য উচ্চজাতের কয়েকটা গোষ্ঠী 'নিশ্চিতভাবে মহান ইওরোপোয়েড মানবতার বিভাগ থেকে এসেছে', অথচ পরের সময়ে আবার বলছেন '[সেসবের] একটারও বৈশিষ্ট্যে অন্য ইউরোপিয় স্টকের সাথে তুলনীয় নয়।' তারা আরও বললেন জাতিগত সম্পর্ক নিয়ে ওঠা প্রশ্নের (question of racial affinities) সমাধানের জন্যে, উত্তর আর দক্ষিণে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে আরও বড়ভাবে গবেষণা করা দরকার।

anthropometer ব্যবহার করে, মানুষের দেহের মাপ নিয়ে এবং সেই মাপের

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তালিকা তৈরি করে ইরাবতী চল্লিশ, পঞ্চাশ ষাটের দশকের গবেষণায় বিপুল সংখ্যক Anthropometric, জাতিবাদী চলক, ব্যবহার করে মানব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের 'অগোছালো'তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন মানব অভিবাসনের প্যাটার্ন আর জাতিগত মিশ্রণ দিয়ে। যদিও 'রেস' বিভাগটিকে মূল ফর্ম হিসেবে খুব বেশি ব্যবহার করেন নি, গোষ্ঠী আলোচনায় আর তাদের উপস্থাপনে 'রেসিয়াল' শব্দটা আখছার ব্যবহার হয়েছে। ইরাবতী 'রেস'এর তুলনায় বেশিবার 'রেসিয়াল' শব্দ ব্যবহার করলেন। তাঁর গবেষণায় ব্যবহার করা গোষ্ঠীগুলোকে রেস বললেন না, বললেন 'রেসিয়াল ট্রেট'ওয়ালা (সাব)কাস্ট, এবং 'ট্রাইব।' তিনি গবেষণায় 'রেসিয়াল' শব্দ ব্যবহার করে শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার যোগসূত্র খুঁজতে চেয়েছেন, এইভাবে তিনি ভারতের গবেষণায় অন্য পার্থক্যগুলিকেও রেসিয়ালাইজ করেফেলেন।

ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং ইরাবতী

In the Cause of Anthropology, The Life and Work of Irawati Karve প্রবন্ধে APPRAISING KARVE'S WORK: CELEBRATING THE DIVERSITY OF (HINDU) INDIA শীর্ষকে ইরাবতী কার্ভের জীবনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সূত্রে নৃতাত্ত্বিক নন্দিনী সুন্দর বলছেন ইরাবতীর ভাবনা ছিল ভারতের বৈচিত্র রক্ষা। এককেন্দ্রিকতা (যেমন পারসোনাল ল') বা এক ধরণের ধর্মাচার চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন, 'আজকের ভারতের সামনে কৃষ্টিগত তিনটে অক্ষে ঘোরাফেরা করছে, ধর্ম, জাতি এবং পরিবার - প্রবণতা হ'ল পার্থক্য কমিয়ে দিয়ে (এক ভাষা, এক সিভিল কোড এবং জাতি ধ্বংস করে) অভিন্নতার পরিবেশ তৈরি করা ...এই উপমহাদেশকে নেশনে রূপান্তরিত করা কঠিন, কারন সেটা কৃষ্টিগত সমস্যা, কিন্তু মাঝেমধ্যে এককেন্দ্রিকতা চাপিয়ে দেওয়া উৎসাহ এই বৈচিত্রকে ধ্বংস করবে, অথচ নৈতিক এবং কৃষ্টিগত দিক দিয়ে এই বৈচিত্রকে রক্ষা করা দরকার। এককেন্দ্রিকতা প্রশাসনিক চাহিদা হতে পারে, কিন্তু কখনওই এটা কৃষ্টির দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় নয়। পুরোনো ধরণের টুকরো টুকরো জীবন, সমাজ শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই অনেকেই সেই অভিজ্ঞতায় বৈচিত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। কিন্তু কিন্তু পুরানো জীবনধারারও কিছু মূল্যবান কৃষ্টিমান বৈশিষ্ট্য ছিল, সে সব আমাদের রক্ষা করতে হবে।'

ইরাবতী মনে করতেন ভারতের মূল্যবান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হল সহনশীলতা আর বৈচিত্র্য নিয়ে জনমানসে সচেতনতার ধারণা। জাতি এবং যৌথ পরিবার হাতেগোণা ব্যক্তির ওপর নিপীড়ন চাপালেও এই কাঠামো ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার পরিবেশও তৈরি করে। ইরাবতী, এই সহনশীলতা আর বৈচিত্র্যকে সাধারণভাবে

হিন্দু চরিত্র হিসেবেই গণ্য করেছেন; তিনি মনে করেন উচ্চমন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী কৃষ্টি এক দিকে যেমন পথনির্দেশনা দেয় অন্যদিকে একতার পরিবেশও তৈরি করে। নন্দিনী সুন্দরের মন্তব্য, এবাবদে ইরাবতীর মানসিকতা অন্য সমাজতাত্ত্বিকের কাছাকাছি। অধিকাংশ ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের নিয়ে আলোচনায় অসীম অবহেলা দেখিয়েছেন, সংখ্যালঘুকে 'ভারতীয় কৃষ্টি'র অংশ মনে করেন নি। তাঁর বক্তব্য ভারতীয় সমাজতত্ত্বচর্চা হিন্দু ঐক্যমত্যের বাইরে বেরোতে পারে নি - এই হিন্দু চরিত্র লুকিয়ে থাকে জাতীয়তাবাদের ছলচাতুরি আর সামাজিক সার্বজনীনতার বুকনির ঘোমটায়; হিন্দুধর্মের মহান সহনশীলতা সম্পর্কে ইরাবতী লিখছেন, 'ভারতের একতা মূলত কৃষ্টিশীল একতা – যার ভিত্তি হাজার হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় পরম্পরা। প্রত্যেক অঞ্চলের শিক্ষিত, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বেদ, ব্রাহ্মণ আর স্মৃতি পাঠ করেন... নাটক হোক, কবিতা হোক, ব্যাকরণ হোক, রাজনীতি হোক, যুক্তিবিদ্যা হোক বা দর্শনই হোক, এই শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যে সব উৎকর্ষ বা মধ্যমানের সাহিত্য কৃষ্টি যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তার গর্ভগৃহ লুকিয়ে আছে শাস্ত্রীয়, বৈদিক সাহিত্যে।'

সাধারণভাবে সমাজতাত্ত্বিকেরা ইসলাম এবং খ্রিষ্টবাদকে ভারতীয় সমাজে মিশে যেতে ব্যর্থ হওয়া শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই দুই সমাজের বিরুদ্ধে উপনিবেশিক লব্জ তুলে আক্রমণ শানানো হয়েছে - এক দিকে খ্রিষ্টধর্মীয়দের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে ইওরোপিয় উপনিবেশিক সময়ের প্রেক্ষিতে, অন্যদিকে ইসলাম আর মুসলমানদের ওপর আঘাত করা হয়েছে মৌলবাদ তোষণের যুক্তিতে। নন্দিনী বলছেন এরা ভুলে গেছে ইরাবতীরই কথা 'ভিন্ন ভিন্ন সমাজ তাদের হৃদয়ের শুভেচ্ছার সৌন্দর্য আর পবিত্রতার অনুভূতি প্রকাশ করে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে।' ওহানলন (O'Hanlon, Rosalind. 1985. Caste, conflict and ideology: Mahatma Jotirao Phule and low caste protest in nineteenth-century Western India) সূত্রে নন্দিনী মনে করেন মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের মনে এই ধারণা তৈরি হয়েছে মুসলমান সাম্রাজ্যের [তিনি মুসলিম এম্পায়ার শব্দবন্ধ ব্যবহার করছেন] আগ্রাসনের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে; খ্রিষ্টিয় ধর্মপ্রচারকদের আগ্রাসনী চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে এবং একে [এই ব্রাহ্মণত্বকে] দেখা হয়েছে অন্যধর্মের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। নন্দিনীর বক্তব্য ধর্মের সংশ্লেষী চরিত্র নিয়ে ইরাবতীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না, বাংলা বা উত্তর প্রদেশে যেমন বিপুল সংখ্যায় মুসলমান সম্প্রদায় আছেন, মহারাষ্ট্রে যেহেতু তার অভাব আছে, তাই অন্য ধর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত, প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক যোগাযোগও গড়ে ওঠে নি।

খ্রিষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম ভারতে কতটা বৈচিত্রের পরিবেশ তৈরি করে সে বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকভাবে খুব কিছু বোঝা-শোনার চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল সমাজতাত্ত্বিকদের প্রবণতা হল ধর্মকে সামাজিক আঠা হিসেবে

দেখানো, তাই সমাজবিজ্ঞানীরা কৃষ্টিকে ঐতিহাসিকভাবে পাঠ করার চেষ্টা করলেও তারা উপনিবেশিক ইতিহাসের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি। ইরাবতী মনে করতেন ধর্মীয় একতা যেহেতু ভাষিক অঞ্চল ভেদ করেছে এখানেও তিনি মুসলমান আর খ্রিষ্টানদের বিচ্যুত উপাদান (deviant elements) হিসেবে দেখছেন, এবং দেশভাগের সম্পূর্ণ দায় মুসলিম লিগের ওপর চাপিয়েছেন। ১৯৪৭এর মার্চ-এপ্রিলে এশিয়ান রিলেশন কনফারেন্সে বক্তৃতা করতে গিয়ে ইরাবতী বলছেন, 'মুসলমানেরা [বলছেন মহামেডান] এদেশে হাজার বছর ধরে বাস করছেন। তারা ভারতে কৃষ্টিশীল একতা তৈরি করার প্রথম দল। তাদের মধ্যে দেশজ চরিত্র বিকশিত হলেও, যেহেতু তাদের ধর্মকেন্দ্র ভারতের বাইরে এবং ধর্ম-ভায়েরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, [তাই] দেশের বাইরে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানেদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেতনা নিয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার বিচিত্র চরিত্র নিয়ে, তারা উত্তরের আর চরম উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলোয় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। হাজার ধরে পারস্পরিক মেলামেশা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি তাকে মানবিক মূল্যবোধ শূন্য সমাজে পরিণত করেছে বলেই ভারতীয়, বাকি জনগণের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সমঝোতায় পৌঁছানো অসম্ভব। তারা অন্য জনসমাজের ধর্মীয়, নৈতিক, এবং নান্দনিক সৃষ্টি সম্মানও করে না, বোঝারও চেষ্টাও করে না... এক সময়ে অনেক ভাষিক এলাকায়, ধরা যাক বাংলায় মুসলমান সমাজ, ধর্মীয় পরিবর্তনের আগের সময়ের বাস, ভাষা, প্রথা অবিকৃত রেখেছে, আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে নতুন বাংলার সৃষ্টি হিন্দু মুসলমানের যৌথ উদ্যোগেই সম্ভব হবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারতের মুসলমান রাজনীতি সেই প্রবণতায় বিচ্ছিন্নতার বোধ তৈরি করেছে, তারা একই ভূমিতে একসঙ্গে বাস করার, একই ধরণের জীবনযাপন করার দীর্ঘ সময়ের প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশের সমাজ থেকে আলাদা থাকার কথা ভাবছে। বিশ্বের সামনে ভারতের ঐক্যবদ্ধ মুখ উপস্থাপন করতে এই জাতিবাদী দ্বন্দ্বটি (রেসিয়াল কনফ্লিক্ট) কৃষ্টি সমঝোতা সূত্রে অথবা প্রভূত মূল্য চুকিয়েও সমাধান হবে না।'

মাথায় রাখতে হবে ইরাবতীর তৈরি জাতিবাদী দ্বন্দ্বের সংজ্ঞায় জাতি, ভাষা এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্ব অস্পষ্ট থেকে গেলেও পরের দিকে তাঁর লেখায় বারবার গুরুত্ব পেয়েছে ভারতের বহুধর্মীয়, বহু কৃষ্টিক সামাজিক চরিত্র বজায় রাখার বিষয়টি। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইসলাম বা খ্রিষ্টত্বকে চিরাচরিত ভারতীয় সমাজের অঙ্গ হিসেবে দেখেন নি, বরং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের নীতি অনুযায়ী ধর্ম আর কৃষ্টিকে অভিন্ন বিষয় মনে করেছেন এবং তার লেখায় সেই ভাবনা বারবার উঠে আসছে। কিন্তু এর বহু পরে ১৯৬৩র প্রবন্ধ রেসিয়াল ফ্যাক্টর ইন ইন্ডিয়ান সোসাল লাইফএ বলছেন, 'বহু হিন্দু ধারণা সরকার আরেকটু বুদ্ধিমান হলে সমস্ত মুসলমান, খ্রিষ্টিয়কে দেশ থেকে বার করে দেশকে শুধুই হিন্দুর জন্যে তৈরি করতেই পারত। কিন্তু মুসলমান,

খ্রিষ্টিয়রা না থাকলে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ, জৈন-হিন্দুদের মধ্যে আর দক্ষিণজুড়ে লড়াই হত শৈব আর বৈষ্ণবদের মধ্যে। যুক্তিবাদী মানবতাবাদীর প্রাথমিক লক্ষ্য একটিমাত্র ধর্মের প্রতিষ্ঠা নয়, বরং তারা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করবে যাতে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্মান নিয়ে একে অপরের সাথে বসবাস করতে পারে। ...আরও একটা একটা প্রশ্ন তোলা হয়, কেউ কোথাও কত দিন বাস করার অধিকার অর্জন করে। একটা ব্যক্তির নয় তার বংশ নিয়ে বলা হচ্ছে। প্রশ্নটা শুধু ভয়ঙ্করই নয়, অকিঞ্চিতকরও বটে। ...আমরা কারা সেটা খুঁজে বার করা খুবই আকর্ষণীয় কাজ – সামগ্রিকভাবে ভারতীয় তো বটেই, কিন্তু শুধু পূর্বজ আর ভূমির ওপর নিজের আধিপত্যের দাবির কজল্পনা খুবই ভুলভাল ব্যাপার।'

তিনি চাইতেন ভবিষ্যতের দাঙ্গা যদি থামাতে হয়, তাহলে সরকার দাঙ্গা নিয়ে খোলাখুলি তদন্ত করুক। তিনি মারাঠি জাতীয়তাবাদ ধারণ করতেন হয়ত সংযুক্ত মহারাষ্ট্র মুভমেন্টের সূত্রে এবং ভারত জুড়ে হিন্দি চাপানোর যেমন বিরোধিতা করেছেন তেমনি সরকারি পরীক্ষায় ইংরেজির প্রাধান্যেরও বিরোধিতা করেছেন।

প্রবন্ধ সূত্র THIAGO PINTO BARBOSA, Making Human Differences in Berlin and Maharashtra: Considerations on the Production of Physical Anthropological Knowledge by Irawati Karvé

নাজি রাজনীতিতে ভারতবিদ্যা চর্চা, লুডউইগ এলসডর্ফ, জার্মান ভারততত্ত্ববিদ্যা এবং উপনিবেশবিরোধিতা

বৈজয়ন্তী রায়

জার্মান ভারততত্ত্ববিদ লুডউইগ এলসডর্ফ বেদ, বৌদ্ধপন্থ এবং জৈনপন্থ চর্চা বিশেষ করে ভারতবর্ষ সভ্যতা আলোচনায় প্রভূত অবদান পেশ করেছেন। তাঁর জীবনের প্রায় অনালোচ্য নাজি পর্ব নিয়ে বৈজয়ন্তী রায় বিশদে আলোচনা করেছেন। আমরা তাঁর Knowledge of India as an Instrument of Nazi Politics: Ludwig Alsdorf, German Indology and Indian Anti-Colonialism শীর্ষক প্রবন্ধটি, নাজি রাজনীতিতে ভারত চর্চা, লুডউইগ এলসডর্ফ, জার্মান ভারততত্ত্ববিদ্যা এবং উপনিবেশবিরোধিতা শীর্ষকে ভাবানুবাদ করে দেখাব ভারতবর্ষীয় উপনিবেশবাদ বিরোধী চর্চকরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধিতার অবস্থান থেকে যেমন করে কেউ নাজি জার্মানি, কেউ বা ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসনের মুখাপেক্ষী হচ্ছিলেন, তেমনি নাজি জার্মানিও তাঁর আভ্যন্তরীণ জাতিবাদী আর্যতত্ত্ব এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবস্থান নির্ণয় করতে ভারতবর্ষচর্চা করেছে। নাজি রাষ্ট্রকে 'আধুনিক উপনিবেশিক' ভারতবর্ষ বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করার কাজে কাজে প্রভূত সহযোগিতা করেছেন ভারতবিদ্যাচর্চা বিশেষজ্ঞ লুডউইগ এলসডর্ফ। আমরা দেখব নাজি রাজনীতিকেরা, এলসডর্ফএর নাজি সংগঠন NSDAPর সদস্যতার থেকেও, তাঁর জৈনপন্থী জ্ঞানচর্চার থেকেও, আধুনিক ভারতবর্ষ বিষয়ক জ্ঞানকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। নাজি শাসকরা সাধারণত এইভাবেই বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের ট্রিট করতেন। নাজি শাসনে এলসডর্ফের ইউটিলিটি ছিল আধুনিক উপনিবেশিক ভারতবর্ষ বিষয়ে তার অধীত জ্ঞান এবং সেই সূত্রে তিনি শুধু ন্যাশনাল সোসালিস্ট রাষ্ট্রের থাকবন্দীতে গুরুত্বপূর্ণ ঠাঁই করে নেন না, নাজি রাষ্ট্রের পতনের পরেও তিনি স্বমহিমায় জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বাসিত হন। শেষে দেখব যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে খুব সহিজের শুধু এলসডর্ফই নয় নাজি জামানায় কাজ করা অধিকাংশ অধ্যাপক ডিনাজিফিকেশনের ছাঁকনি এড়িয়ে নিজেদের কেরিয়ার গুছিয়ে নেন।

রাইনল্যান্ডেরর ধর্মযাজকের পুত্র লুডউইগ এলসডর্ফ হ্যামবুর্গ ইউনিভার্সিটি ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, বিশেষ করে সংস্কৃত এবং Islamkunde ইসলামি ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয় নিয়ে পাঠ নেন। জৈন বিশেষজ্ঞ Walther Schubringএর অধীনে ১৯২৮এ মধ্যযুগের সংস্কৃত অপভ্রংশ ভাষায় জৈন পুথি কুমারপালপ্রতিবোধ নিয়ে গবেষণা। বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ভারততত্ত্ববিদ Heinrich Lüdersএর অধীনে কাজ। ১৯৩০এর অক্টোবরে বিদেশ মন্ত্রক, আরও কয়েকটা মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিতে আসা। ভারতবর্ষ, বার্মা, শ্রীলঙ্কা ঘুরে তিনি হয়ে উঠলেন উপনিবেশিক ভারতবর্ষ বিষয়ে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ।

১৯৩২এর জুলাইতে জার্মানি পৌঁছে সময় নষ্ট না করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে লুডউইগ এলসডর্ফ ঝাঁপ দিলেন নাজি রাজনীতিতে; ১৯৩৩এর ১ আগস্ট সদস্যপদ পেলেন, কার্ড সংখ্যা হল ২৬৯৭৯৩১। ১৯৩৪এর ১৭ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শ্রম শিবির Arbeitsdienstএ যোগদান। কিয়েল ইউনিভার্সিটিতে তিন সপ্তাহের প্রুশিয় অধ্যাপক একাডেমিতে Dozentenakademie শিক্ষানবিশী। শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল রাইখের ইউনিভার্সিটির এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নেওয়াদের নাজি তত্ত্বে মগইজধোলাই করতে 'গবেষক-সেনা' (scholar-soldier) তৈরির উদ্যম।

নাজি অধ্যাপকেরা শারীরিক যোগ্যতার পাশাপাশি National Socialist thinking, National Socialist disposition বিষয়েও শংসাপত্র দিতেন। শিবিরে এলসডর্ফ যে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, সে সব সূত্রে বোঝা যায় তার রাজনৈতিক উৎসাহ ছিল জাতিবাদী বিজ্ঞান, Rassenkunde, জার্মানির বাইরে জার্মান Rassenkunde নিয়ে - মাথায় রাখতে হবে এই দুটো বিষয় ছিল নাজি রাজনীতির অন্যতম অক্ষদণ্ড।

অধ্যাপনায় যোগ্যতামানের জন্যে দ্বিতীয় গবেষণাপত্র habilitation বার্লিন ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৩৫এর জুনে সম্পূর্ণ করে সেখানেই ভারতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। habilitationএর বিষয় ছিল সংস্কৃত অপভ্রংশ ভাষায় রচিত দশম শতকের কবি পুষ্পদন্তের জৈন পুথি হরিবংশপুরাণের সটিক অনুবাদ। habilitation প্রকাশিত হল ১৯৩৬এ। তাঁর habilitation শুধু ভারতত্ত্বের পণ্ডিতেরাই সহর্ষে গ্রহণ করলেন না, নাজি দলের বিজ্ঞান দপ্তর Hauptamt Wissenschaftএর পক্ষে নাজি পক্ষীয় গবেষকদের কাজ মূল্যায়ন করা Wolfgang Erxleben বললেন তাঁর গবেষণা, 'টেক্সচুয়াল সমালোচনার নিখুঁত উদাহরণ।' জোড়া গবেষণা সুবাদে লুডউইগ হয়ে উঠলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদ।

গবেষণা, অধ্যাপনা ছাড়াও এলসডর্ফ নাজি দলের কাজকর্মে অংশ নিয়েছেন। যোগ দিয়েছেন নাজি পার্টির অ-মেয়াদী জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর বৈদেশিক বিভাগ Deutsche Dozentenschaftএ। এই দপ্তর যোগদানের পরেই এলসডর্ফ নাজি জার্মানির একমাত্র উপনিবেশিক ভারতবর্ষ বিশেষজ্ঞ গণ্য হবেন। ১৯৩৬এর ডিসেম্বরে নাজি আধা-সামরিক সংগঠন ন্যাশনাল সোসালিস্ট মোটোর কর্পস Nationalsozialistisches Kraftfreikorps বা NSKKতে যোগ দিলেন। ১৯৩৮এর ১৮ ফেব্রুয়ারি মুনস্টার ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতায় যোগদানের যোগ্যতা হিসেবে তাঁর NSKKএর মোটর বোট বিভাগের Kraftbootsturm 4\Kb দ্বিতীয় লেফট্যানেন্ট Sturmmann পদ উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৩৬এ ন্যাশনাল সোসালিস্ট লেকচারার্স এসোসিয়েশন বা NSDBতে যোগ দেন।

রাজনৈতিক বিশ্বস্ততায় প্রশ্ন

নাজি দলের প্রত্যেকটি সদস্যর, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি সদস্যের দলের প্রতি রাজনৈতিক বিশ্বস্ততা তিল তিল করে খতিয়ে দেখা হত। শুরুর দিকে লুডউইগ এলসডর্ফের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাতেই প্রশ্ন উঠল। শ্রম শিবিররের ফিল্ড মাস্টার ওল্ডোয়েলার রিপোর্টে লিখলেন, শ্রম শিবিরে এলসডর্ফ, 'নিজেকে সুন্দর পরিচালনা করেছিলেন, ক্যাম্পের জীবনে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন ... তিনি আদর্শ পদ্ধতিতে নিজেকে সত্যিকারের কমরেড হিসাবে প্রমাণ করেন'। এলসডর্ফের জন্ম

প্রদেশ সার্ল্যান্ডের NSDAP শাখার রিপোর্টও সদর্থক হল। বলা হল সে জার্মানির প্রতি বলিপ্রদত্ত। সার্ল্যান্ড জার্মানিতে ফেরত আনার নাজি প্রোপাগান্ডা ‘ব্যাটল অব সার্ল্যান্ড’এর অন্যতম নিবেদতপ্রাণ সৈনিক। কিন্তু কিয়েলের লেকচার্স একাডেমির রিপোর্ট এলসডর্ফের পক্ষে গেল না। বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো অস্বাক্ষরিত এক সমীক্ষায় বলা হল সে রাজনৈতিকভাবে পরিষ্কার করে মনের ভাব প্রকাশ করে না, তার আচার আচরণ ন্যাশনাল সোসালিস্টিক সুলভ নয় এমন কী নাজি বুদ্ধিজীবিদের মতও নয়; লোকটা গর্বিত, বাচাল, মন অহংএ টইটম্বুর।

যে ভারতাত্ত্বিকের ওপর নাজিরা বাজি ধরেছে, তার ন্যাশনাল সোসালিস্ট বিরোধী মনোভাবের অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রকের Reichs und Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (আক্ষরিক অর্থে রাইখ এবং প্রুশিয়ান বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং জনশিক্ষা মন্ত্রণালয়) পক্ষে তাকে আদৌ শিক্ষকতার ছাড়পত্র Venia Legendi দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সাধারণত habilitation শেষ করার পর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকতার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। অস্বাক্ষরিত, কোনও এক বছরের ১৮ অক্টোবরের জনৈক HZ কোড নামের ইন্ডোলজিস্টএর (হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ হাইনরিশ জিমারও হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল) ১৯৩৫এর রোম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে লুডউইগ এলসডর্ফএর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর রিপোর্টে বলা হল ‘সম্মিলনে এলসডর্ফ উল্লেখযোগ্য beachtlich পেপার পড়লেও তাকে আমার একবারও ন্যাশনাল সোসালিস্ট দলের যোগ্য সদস্য মনে হয় নি। HZ লিখছেন বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ইন্ডোলজি বিভাগে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ, নাজি SS আধিকারিক অধ্যাপক Bernhard Breloer যোগ দেবেন। তাঁর পথ নির্দেশে লুডউইগ এলসডর্ফ যোগ্য নাজি হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। নিদান ছিল, তাকে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় পাঠানো হলে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব না বোঝার খামতি দূর হবে। তাকে শিক্ষক হওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হোক, প্রয়োজনে তুলে নেওয়াও যেতে পারে।

এত বিরোধিতা সত্ত্বেও এলসডর্ফ শিক্ষকতার ছাড়পত্র পেয়েছিল। নাজি কর্তৃপক্ষ বাধা হয় নি। ভাগ্যের ফের হল, যে হাইনরিশ জিমার, লুডউইগ এলসডর্ফএর মানসিকতা অনাজি হিসেবে দাগিয়ে দিয়েছিলেন, তারই শিক্ষকতার ছাড়পত্র নাজিরা তুলে নেয়, দেশ ছাড়তে বাধ্য হন (২০১০ সালে ইউপিএ আমলে ভারত সরকারের আইসিসিআর, হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটিতে রাইখস্ট্যাগের নাজি, এসএস বুদ্ধিজীবি হাইনরিশ জিমারের নামাঙ্কিত চেয়ার চালু করে। আয়রনি হল, সে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল বউএর জন্যে। নাজিরা আবিষ্কার করে তার বউ ইহুদি অস্ট্রিয় পরিবারে জন্ম। এই অভিযোগে নাজি ক্যাডার জিমারের অধ্যাপনার লাইসেন্স কেড়ে জার্মানি থেকে বার করে দেওয়া হয় - অনুবাদক)।

জিমারের প্রস্তাব মত Bernhard Breloerএর কাছে এলসডর্ফ নাজি তাত্ত্বিকতায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিল কী না, সে বিষয়রে নাজি নথিপত্র নীরব – কিন্তু এলসডর্ফকে নিয়ে ব্রেলোয়ারের সমীক্ষা পাওয়াগেছে। ১৯৩৬এ বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ব্রেলোয়ার এলসডর্ফের পক্ষ নিয়ে, ফিলোজফিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডিনকে জানালেন, সে এত দিন শুধুই ভাতা পাচ্ছে, তার প্রমোশন দরকার। ব্রেলোয়ার যুক্তি ছিল দুটো, এলসডর্ফের ব্যতিক্রমী গবেষণা, NSDBর মত গুরুত্বপূর্ণ নাজি সংগঠনে সদস্যপদ। ১৯৩৮এর ১৪ এপ্রিলের চিঠিতে তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত পড়াশোনার ইতিহাস উল্লেখ করে মুনস্টার ইউনিভার্সিটিতে এলসডর্ফের চাকরির সম্ভাবনা আছে কী না লিখবেন। এই চিঠিতে এলসডর্ফের দলীয় সদস্য পদ বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ ছিল না। প্রাপকের নাম ছাড়া ৩ এপ্রিল, ১৯৩৮এর একটি নথিতে ব্রেলোয়ার এলসডর্ফের ইংরেজি আর হিন্দুস্থানী ভাষার অনায়াস দক্ষতা উল্লেখ করে বলছেন সে নাজি আধাসামরিক বাহিনী মেরিন SA, Deutsche Dozentenschaft জার্মান প্রভাষক দফতরের বিদেশ বিভাগে যুক্ত। যেহেতু এলসডর্ফের মত অ-মেয়াদী শিক্ষকের জন্যে জার্মান প্রভাষক দফতরের সদস্যপদ জরুরি তাই হয়ত ব্রেলোয়ার, বিদেশ দপ্তরের বিভাগে তাঁর যুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন তার দক্ষতার রাজনৈতিক তাৎপর্য। তবে ব্রেলোয়ার খোঁচা দিয়ে বলছেন এলসডর্ফের একাডেমিক পড়ানোয় নাজি দলের আদর্শগত বিষয়টি উঠে আসে না। তবে একমাত্র ব্রেলোয়ারের রিপোর্টে তাঁর নাজি আধাসামরিক বাহিনী মেরিন SAর সদস্যতার উল্লেখ পাচ্ছি, অন্য কোথাও এটি পাইনি। জার্মান প্রভাষক দফতরের প্রশ্নপত্রে কিন্তু এলসডর্ফ, SS বা SA সদস্যপদের তথ্য অস্বীকার করছেন।

মেরিন SAর ঘাঁটি ছিল হামবুর্গে। যে কোনও বিরোধিতা দমন করতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ায় তাদের (অ)খ্যাতি ছিল চরম। মেরিএন SA আর NSKKর মোটরবোট দুটো আলাদা বিভাগ। হয়ত ব্রেলোয়ার দুটোকে গুলিয়েছেন। না হয়, এলসডর্ফ ১৯৩৫এর বসন্ত পর্যন্ত হামবুর্গে কাটিয়েছেন, এমনও হতে পারে, NSKKর মোটরবোট বিভাগে যোগ দেওয়ার আগে তার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেওয়া ছিল মেরিএন SA বিভাগে। তিনি মেরিএন SAর সদস্য হোন বা নাই হোন, NSKKর মোটরবোট বিভাগের সদস্যতা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার তার নাজি তাত্ত্বিকতায় খাদ ছিল না। NSKK মূলত SA আর SSএর সঙ্গে মিলে কাজ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ীরা SA আর SSকে দুষ্কৃতি সংগঠন দাগালেও NSKKকে ছাড় দিয়ে, তার সদস্যদের কমগুরুত্বের দুষ্কৃতি, লেসার এভিল বলেছে। যুদ্ধের পরে এটাই তার পুনর্বাসনের হাতিয়ার হয়।

১৯৩৬এ বার্লিন ইউনিভার্সিটির NSDB ইউনিট রিপোর্ট দিল এলসডর্ফএর ওপর ব্রেলোয়ারের সদর্থক প্রভাব পড়ছে। NSDBর অনামা প্রতিনিধি, বার্লিনের

টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির Gau (প্রশাসনিক বিভাগ) বিভাগের NSDBর প্রধান উইলি উইলিংকে সমীক্ষায় জানালেন ব্রেলোয়ারের সঙ্গে কাজ করা এলসডর্ফ 'রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পালনে আগের থেকে অনেক বেশি উন্মুখ' যদিও 'এখনও সংগঠন তার বিশ্ববিক্ষা মূল্যায়ন করে নি।' ১৯৩৮এর লিপজিগ ইউনিভার্সিটিতে ভারতবর্ষীয় ভাষাতত্ত্ব বিভাগের চাকরিতে এলসডর্ফ আবেদন করে ব্যর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ফ্রেড্রিশ ওয়েলার সেই পদে যোগ দেয়। ওয়েলার ১৯৩৩এর নভেম্বরে জার্মান ইউনিভার্সিটিগুলোর অধ্যাপকদের নিয়ে হিটলারের প্রতি যৌথ প্রকাশ্য আনুগত্য স্বাক্ষরের অন্যতম কারিগর (বিশ্ব আদলুরি আর জয়দীপ বাগচী The Banality of Indology: Franco, Pollock, and the Friedrich Weller Prize প্রবন্ধে বলছেন, দুই বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ শেলডন পোলক, ওয়েন্ডি ডনিয়ের লিপিজিগ ইউনিভার্সিটির ফ্রেডরিশ ওয়েলার সম্মান পেয়েছেন। একজনও সে সম্মান নিজের হাতে নিন নি। তারা কী Johannes Hertelএর এন্টিসেমিটিজম আর Wellerএর নাজি যোগ জানতেন? বিশ্ব-জয়দীপ বলছেন পোলক 'ডিপ ওরিয়েন্টালিজম'এর প্রবক্তা হয়েও কীভাবে এই প্রাইজ নিতে পারলেন? বিবেকে বাধল না? - অনুবাদক) ছিলেন। চাকরি পাওয়ার একমাত্র শর্ত ছিল ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টির প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য। ওয়েলার আর এলসডর্ফএর মধ্যে পার্থক্য ছিল দলীয় আনুগত্য বিষয়ে গোপন সমীক্ষা। আমরা এর আগেই দেখেছি, দলেই এলসডর্ফএর আনুগত্য নিয়ে সমীক্ষাকারীদের দ্বিধা ছিল। ১৯৩৭এর ১ ফ্রেব্রুয়ারি, হিজিবিজি স্বাক্ষর করা Dresden-Bautzenএর SD subdivision (Unterabschnitt)এর প্রধান, সমীক্ষায় বললেন তার একাডেমিক রেকর্ড প্রথম শ্রেণীর হলেও রাজনৈতিক প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন আছে - নিয়মিত নাজি প্রকল্পগুলোয় যোগ দিচ্ছে, চিঠিতে হাইল হিটলারও লিখছে, কিন্তু ন্যাশনাল সোসালিজম নিয়ে অনেকেটাই অনাবেগী। ২৩ মার্চ, ১৯৩৭এর আরেকটি সমীক্ষায় বলা হল, 'যদিও সে আমাদের পার্টি কমরেড, কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ন্যাশনাল সোসালিস্টদের সঙ্গে না মিশে মুক্তমনাদের সঙ্গে বেশি মেশে। চরিত্রগতভাবে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, পেশাদার (রিপোর্টে ক্লাইম্বার, streber বলা হচ্ছে), নিজের সুবিধের জন্যে যে কোনও অবস্থা কাজে লাগাতে ওস্তাদ। বার্লিন ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক Erhard Landtও (ইউনিভার্সিটিতে ন্যাশনাল সোসালিজম প্রচারে তার মত ফ্যানাটিক কেউ ছিল না) NSDBর হয়ে ১৯৩৮এর ২৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরকে পাঠানো এলসডর্ফ নিয়ে সমীক্ষায় খুব একটাও সদর্থক কথা বলেন নি। তিনিও আদর্শের প্রতি আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে বললেন সে স্বার্থবাজ যুবা, অনাকর্ষণীয় শিক্ষক, ইউনিভার্সিটির প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে অসচেতন। অর্থাৎ তখনও এলসডর্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজি ক্ষমতাসীনদের তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মুনস্টার ইউনিভার্সিটিতে ভারততত্ত্বের অধ্যাপক Richard Schmidt ১৯৩৮এ

অবসর নিলে, তার পদে এলসডর্ফকে এলেন। মাইনে নয়, ভাতার বিনিময়ে। রাইখের ফ্যাকাল্টি অব ফিলোজফির শিক্ষা মন্ত্রী Bernhard Rustএর যুক্তি ছিল, সে যেহেতু ভাতা পাবে, তাই তার পিছনে ইউনিভার্সিটির অতিরিক্ত খরচ নেই। ইউনিভার্সিটির কাগজপত্র দেখে মনে হয়েছে কর্তৃপক্ষ তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাথা ঘামান নি, যদিও ১৯৩৩এর পর ইউনিভার্সিটি রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক থাকাকে যতটা গুরুত্ব দিত, দল-আনুগত্যকে ততটা গুরুত্ব দিত না। ব্রেলোয়ার এই বিষয়টা জানতেন বলেই চিঠিতে হয়ত এলসডর্ফের দলীয় পদাধিকার উল্লেখ করেন নি।

নাজি রাষ্ট্রে ভারততত্ত্বের উপযোগিতা মুনস্টার ইউনিভার্সিটিতে এলসডর্ফের নিযুক্তি থেকে পরিষ্কার। থার্ড রাইখে একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে ভারততত্ত্বের উপযোগিতা আমরা আরও একটু গভীর নজরে দেখব। মুনস্টার ইউনিভার্সিটির তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটির নাজি অধ্যাপনা সংগঠনের প্রধান অধ্যাপক এরিক হফম্যান ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮এ ডিন অব ফ্যাকাল্টি অব ফিলোজফিকে চিঠি লিখে এলসডর্ফের নিয়োগের সুপারিশ করেন। তিনি লিখলেন, I consider it to be urgently necessary that Aryan Philology is reintroduced at the University of Münster. Serious philological research is impossible without an initiation into Sanskrit. The issue is not only about purely linguistic questions, but also about the problem of the original home of Indo-Germans which enjoys national political significance today। হফম্যান মনে করতেন আর্যতত্ত্ব আর আর্য প্রাথমিক বাসভূমি খোঁজার কাজ ভারততত্ত্বচর্চার সঙ্গে সমার্থক। এই দুটো ইস্যুই নাজি রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রধান রাজনৈতিক মূলধন। মুনস্টার ইউনিভার্সিটির প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক, ইসলাম বিশেষজ্ঞ Franz Taeschner মনে করতেন, ভারততত্ত্ব চর্চাই বিশ্বজুড়ে জার্মানিকে সম্মান এনে দেবে। Taeschner ১৯৩৩এ NSDAPতে যোগ দিয়ে জার্মানদের বললেন তারা যেন অন্যভাবে ইসলামকে দেখে। ১৯৩৮এর ১৫ ফেব্রুয়ারিতে ডিনকে চিঠি লিখে বললেন যেদিন থেকে জানাগিয়েছে ভারতবর্ষীয়রা আর্য এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা জার্মানির সঙ্গে জুড়ে থাকা আর্য গোষ্ঠী, ইন্ডোলজি সূত্রে ভারতবর্ষের নাগরিকেরা জার্মানিকে শ্রদ্ধা করেন। জার্মানদের বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি Weltgeltung বৈধতার চক্করে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভারততত্ত্ব চর্চার মাধ্যমে আরও বেশি করে জার্মানি আর ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করল।

[তার সম্বন্ধে অধ্যাপনা জগতের বিপরীত রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও] এলসডর্ফকে Richard Schmidtএর অবসরের পরে কেন অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেওয়া হল তার উপযুক্ত কারন আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। মাথায় রাখতে হবে মুনস্টার ইউনিভার্সিটির নব্বই শতাংশ শিক্ষক ছিলেন NSDAPর সদস্য - যদিও সকলে

রাজনৈতিকভাবে দলীয় কাজে খুব বেশি সক্রিয় ছিলেন না। এলসডর্ফ আর Schmidt দুজনেই NSDAPর সদস্য। আমরা ধরে নিতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এলসডর্ফএর রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি খুব একটা কাজ করে নি বলেই ইউনিভার্সিটিতে তার চাকরিটা হতে পেরেছে।

১৯৩৮ - তার জন্যে জল বিভাজিকা বছর

শিক্ষা মন্ত্রকে কাজ পাওয়ার প্রাথমিক শর্ত ছিল 'হিটলার শপথ'এ অংশ নেওয়া। এলসডর্ফ শপথ নিয়েছিলেন ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৮এ। প্রত্যেক সরকারি আধিকারিককে Beamte, দপ্তরে যোগ দেওয়ার আগে জার্মান, রাইখ আর জনগণের ফুয়েরার, এডলফ হিটলারের নামে আনুগত্যের শপথ নিতে হত। ভাতার বদলে মাইনে পাওয়ার মাস, ১৯৩৯এর সেপ্টেম্বরে নতুন করে 'হিটলারি' শপথ নিলেন। যুদ্ধের পরে আত্মপক্ষ সমর্থনে মিউনিখ ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া বিবৃতিতে বলছেন, এই বছরই মুনস্টারে চাকরি পাওয়া ছাড়াও ঐতিহাসিক Egmont Zechlin তাঁকে Weltpolitische Bücherei আক্ষরিক অর্থে 'বিশ্ব রাজনীতির গ্রন্থাগার' সিরিজে ইতিহাস বই লিখতে আমন্ত্রণ জানাবেন। বইএর সূত্র ধরে নাজি জার্মানিতে এলসডর্ফএর কেরিয়ার চমকপ্রদ বাঁকে উপস্থিত হবে। তিনি নাজি রাষ্ট্র পতনের পরে দাবি করেছিলেন Zechlin তাঁকে জানিয়েছিলেন বইএর চরিত্র কেবল একাডেমিকই হবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে না। তবে Egmont Zechlinএর কেরিয়ার অন্য কথা বলে। তিনি SA আর NSDAPতে যোগ দিয়েছেন ১৯৩৩এই। এই সময়ে তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতা, লেখালিখি গভীরভাবে নাজি বিশ্বদর্শন Weltanschauung এর সঙ্গে যুক্ত।

১৯৪০এ NSDAPর বৈদেশিক দপ্তরের প্রধান আলফ্রেড রোজেনবার্গ সরকারিভাবে Zechlin আর Georg Leibbrandtকে Weltpolitische Bücherei লিখতে নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য নাজি মুখপত্র জাতীয় সমাজতান্ত্রিক মাসিক পত্রিকা Nationalsozialistische Monatshefteয় প্রকাশিত বিশ্বরাজনীতি প্রবন্ধের সঙ্গে বিভিন্ন দেশ নিয়ে পণ্ডিতদের এই সব লেখাপত্রের তথ্য মিলিয়ে জনগণ তার ঐতিহাসিক কর্তব্য ঠিক করবে। এলসডর্ফকে এই প্রকল্পে বেছে নেওয়ার কারন ছিল, তিনি Deutsche Dozentenschaftএর বৈদেশিক দপ্তরে আধুনিক ভারতবর্ষ নিয়ে নিজের হুনর দেখাতে পেরেছিলেন। যুদ্ধের পরের বিবৃতিতে এলসডর্ফ বলছেন, NSDAPর বিদেশ দপ্তরের কাজের দোহাই দিয়ে বই লেখার জন্যে ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি চাইলেন। ইউনিভার্সিটি তাকে ৩০ জুন পর্যন্ত সামরিক কাজে বই লেখার ছুটি মঞ্জুর করল।

১৯৩৯ থেকে মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয় এলসডর্ফএর সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানির বিদেশ মন্ত্রকের

বৈদেশিক নীতিতে সাহায্য করার জন্যে মুনস্টার ইউনিভার্সিটি 'বৈদেশিক দেশ সমূহ আর উপনিবেশিক অঞ্চল' বিষয়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা করে। ১৯৩৯এর গ্রীষ্মে পাঠক্রমের অংশ হিসেবে তিনি 'ভারতবর্ষের মহান ধর্মসমূহ' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। ১৯৪০এর গ্রীষ্মে সংস্কৃত ছাড়াও পড়ালেন দুটি চালু ভাষা হিন্দুস্তানি আর গুজরাটি। 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' নিয়েও বক্তৃতা দেন।

জোয়াকিম ভন রিবেনট্রপ ১৯৩৮এ বিদেশ মন্ত্রী হলে এলসডর্ফ নীতি নির্ধারণের অবস্থায় পৌঁছে যায়। তার ঝাঁক বক্তৃতা নির্ভর করে রিবেনট্রপ জার্মানির বিদেশ নীতি তৈরি করবেন। হিটলার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণমুগ্ধ ছিলেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে জোট চাইতেন। ইংলন্ডের সঙ্গে যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হলে রিবেনট্রপের নেতৃত্বে প্রভাবশালী নাজিরা ভারত উপনিবেশে জার্মানির মুখ উজ্জ্বল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক হল একদিকে উপনিবেশিক শাসকদের তুমুল সমালোচনা করা হবে, অন্যদিকে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো হবে। পরিকল্পনা সফল করতে সমকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান জরুরি ছিল। যে কাজে করতে তৈরি ছিল মুনস্টার ইউনিভার্সিটি। নাজি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিজেদের জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব বোঝাতে বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে কোলাবরেট করল।

ইন্ডিয়েন

Weltpolitische Bücherei সিরিজের অংশ হিসেবে এলসডর্ফ ১৯৪০এ লিখলেন হিটলারের অন্যতম প্রিয় বই ইন্ডিয়েন, ভারতবর্ষ। জার্মান রাজনৈতিক কাঠামোয় ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালাতে, ভারতবর্ষের উপনিবেশ এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধে জার্মান রাজনীতিকদের সম্যক জ্ঞান বাড়াতে ইন্ডিয়েনের পরিকল্পনা। পণ্ডিতি কাঠামোতেও যাতে আম নাজি রাজনীতিবিদের বুঝতে সমস্যা না হয়, সেটাও মাথায় রাখা হয়েছে। ব্রিটিশপূর্ব সময় নিয়ে একটা মাত্র অধ্যায়। বাকি চার অধ্যায়ে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ বিজয়, ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র, সরকারের উপনিবেশিক ভূখণ্ড সামলানো এবং সুরক্ষা প্রক্রিয়া, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থান আলোচিত হল। ব্রিটিশ উপনিবেশের সমালোচনার পাশাপাশি উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোরও বার্তা দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটা সংস্করণ হয়। স্বয়ং ফুয়েরার ইন্ডিয়েন নিয়ে উচ্ছসিত। জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী প্রভাষক সমিতি (National Socialist Lecturers' Association) জানাচ্ছে রাষ্ট্র প্রধান প্রত্যেক পার্টি আধিকারিককে বইটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশ বুঝতে প্রথম বই না হওয়া সত্ত্বেও ইন্ডিয়েনের সাফল্যের কারন কি? প্রাচ্যবিদ Josef Horovitz ১৯২৮এ এই ধরণের প্রভাবশালী বই লিখেছেন। কিন্তু হরোউইজের বই জার্মানিতে নাজি রাজনীতিকদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করতে ব্যবহার হয় নি। সে কাজ করল ইন্ডিয়েন। তবে হিটলার আর সাঙ্গপাঙ্গদের ভারতবর্ষীয় প্রজাদের বিরুদ্ধে জাতিবাদী বিষদ্গারের ছোঁয়া বইতে ছিল না। অতীত ভারতবর্ষের পরিচয় দিতে গিয়ে নাজিবাদী পণ্ডিত Hans F.K. Günther, Egon Freiherr von Eickstedtএর মত এথনোলজিস্ট, নৃতাত্ত্বিকের 'আর্যজাতি তত্ত্ব' রাখলেও জার্মান ভারততাত্ত্বিক Christian Lassenএর Indische Altertumskunde (Indian Archaeology, 4 vols., 1843-1862) মত জাতিবাদী তথ্য বইতে ঠাঁই দেন নি। Christian Lassenএর তত্ত্ব সাদা চামড়ার আর্যরা দৈহিক, মানসিকভাবে অধঃপতিত কালো চামড়ার অনার্য দেশে অভিযান করে তাদের পদানত ক'রে; এ তথ্য ব্যবহার করবেন ম্যাক্সমুলার।

ইন্ডিয়েন, রিবেনট্রপ যুগের নীতি অনুসরণ করে, বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, সে সব দেশের মানুষের নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি নিয়ে বার্তা দেওয়ার কাজ করেছে। অ্যালসডর্ফ ব্রিটিশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিন্দা করে লিখছেন ভারতের মত 'অনিয়ন্ত্রিত, সীমাহীন বর্বরতা নিষ্ঠুরতা আয়ারল্যান্ড এবং ফিলিস্তিনে ঘটিয়ে আমাদের হতবাক করেছে।' ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের জাতিবাদী আখ্যা দিলেও এলসডর্ফ নাজি জাতিবাদী রাজনীতিকেই বইতে বৈধতা দিয়ে লিখলেন 'ব্রিটিশ আর ভারতবর্ষীয়রা আলাদা আলাদা জাতি বলেই তাদের মধ্যে জাতের পার্থক্যটা থাকাই উচিৎ - অথচ উচ্চবর্ণের ভারতবর্ষীয়রা ভারতেরই অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও উপনিবেশিক শাসকেরা তাদের প্রশাসনিক সেবায় অংশগ্রহণ করতে দেয় না; মাথায় রাখতে হবে জার্মান দেশে ইহুদিরা খুবই সংখ্যালঘিষ্ঠ, এবং তারা জার্মান নয়।' এলসডর্ফের অভিযোগ, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয়দের মনে চরম হীনমন্যতা জারিয়ে শাসন জারি রেখেছে। ১৯৩৩এর জার্মান বিপ্লবের পরে এই হীনমন্যতাকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষীয় মনে জার্মান বিরোধিতা জন্ম দিয়েছে।' চুপ করে থাকা কোটি মানুষকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়ো করার জন্যে গান্ধীর প্রশংসা করেছেন। তার এই অবস্থান কিন্তু অতীতের রোজেনবার্গের জাতিবাদী মন্তব্য, জাতিগতভাবে হীনমন্য জনগণ 'ক্লান্ত গান্ধী'র জন্ম দেবে অথবা গোয়েরিংএর গান্ধীকে বলশেভিক দাগানোর বিরোধী। এলসডর্ফের গান্ধী চরিত্র রিবেনট্রপের নেতৃত্বে নতুন জার্মানির প্রতীক, যে জার্মানি গান্ধীর প্রতি সহানুভূতিশীল।

এলসডর্ফের গান্ধী বোঝাল নাজি জার্মানি রোমান্টিক ভারততত্ত্বকে আত্মস্থ করেছে। গান্ধীকে বললেন হিন্দু যোগী। গান্ধির কাছে রাজনীতি আর ধর্ম প্রতিভাত হয়েছে সত্য আর অহিংসারূপে। গান্ধীর সত্যাগ্রহ ইন্দো-ইরানীয় আর্য মানুষদের প্রাচীন ধর্মের আদি ভারতবর্ষীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ। তবে গান্ধীকে প্রাচ্যবাদী আর সত্যাগ্রহকে আর্যত্বে ঢেলে এলসডর্ফ গান্ধীর অহিংসা পদ্ধিতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করলেন।

তাঁর দাবি গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনীতি ব্রিটিশদের বৈপ্লবিক আর হিংসক আন্দোলন দমনে সহজ করছে। সত্যাগ্রহ যতই নৈতিকতাপূর্ণ হোক না কেন, সত্যাগ্রহ নির্ভর করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। নাজিদের আরেকটি নিদান, জাতীয় একনায়কত্বের পক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন, ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র অচল। তার যুক্তি এই যুদ্ধ ভারতের জন্য বৈপ্লবিক তাৎপর্য umwälzender Bedeutung বয়ে আনছে। তিনি বলতে চাইলেন, ভারতবর্ষীয়রা স্বাধীনতা আনতে এই যুদ্ধ পরিস্থিতি ব্যবহার করুক।

ইন্ডিয়েন, নাজি দলে অসম্ভব রাজনৈতিক গুরুত্ব তৈরি করল। দ্বিতীয় সংস্করণ বাজারে এল ফুয়োরার উৎসাহে। এলসডর্ফের বিরুদ্ধে দল না করার যে শৈথিল্যের অভিযোগ অতীতে বারবার উঠেছে, ইন্ডিয়েনের সাফল্য সে সব কলঙ্ক ধুয়েমুছে সাফ করে নাজিবাদে নিবেদন প্রমান করল। প্রমান করল 'থার্ড রাইখ'এ এলসডর্ফের 'রাজনৈতিক উপযোগিতা।' বইএর সাফল্যে নাজি সদস্য এলসডর্ফ হয়ে উঠলেন একাডেমিক অভিজাত। এই সাফল্য আদতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন। এর থেকে আরও একটা বিষয় প্রমান হল, নাজি রাজনৈতিক কাঠামোয়, কোনও গবেষকের অর্জিত জ্ঞানের গুরুত্ব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তার জ্ঞান নাজি রাষ্ট্রের সামনে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

বইএর সাফল্যে তার চাকরি পাকা হল। এলসডর্ফ হলেন ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারতবর্ষ বিষয়ে নাজি দলের প্রধানতম তথ্য সূত্র। এলসডর্ফের লেখা 'ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার বিষয়ে চিন্তাভাবনা' নামে একটি ছোট সমীক্ষা, দখলকৃত পূর্বাঞ্চলের মন্ত্রী আলফ্রেড রোজেনবার্গ ১৯৪১এর বসন্তে হিটলারের হাতে তুলে দেন। শোনা যায় হিটলার নাকী সমীক্ষাকে যথেষ্ট আগ্রহব্যাঞ্জক বলেছিলেন। রোজেনবার্গ বিরোধী রিবেনট্রপ একটি পাল্টা প্রতিবেদন, 'ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের ভিত্তি, বিকাশ এবং পদ্ধতি' হিটলারের হাতে তুলে দেন। এটিরও স্রষ্টা কিন্তু এলসডর্ফ।

ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার

১৯৪১এর এপ্রিলে ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস রাজনৈতিক নির্বাসনে, কলকাতার গৃহবন্দীত্ব এড়িয়ে বার্লিন পৌঁছলেন। নেতাজী অক্ষ শক্তির সঙ্গে জোট গড়ে তুলতে আগ্রহী। সামরিক বলে ভারতবর্ষের উপনিবেশিক শাসন উৎখাতের পরিকল্পনা তার। নেতাজীর দাবি নাজি জার্মানি ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করুক; বিদেশে তার নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার, নতুন স্বাধীন ভারতবর্ষকে স্বীকৃতি দিক। নাজি রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি যে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে সহানুভূতিশীল, সেটা বিশ্বকে বোঝানো আর নেতাজীকে প্রচার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা। মাথায় রাখা দরকার, এমন নয়, জার্মান সরকার এই

প্রথম জার্মান প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা কাঠামোয় ভারতবর্ষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সমাবেশ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ১৯১৪য় জার্মান বিদেশ দপ্তর ইন্ডিয়া ইন্ডেপেন্ডেন্স কমিটি তৈরি করে। এই কমিটি বিদেশে বসেই জোরদার ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালিয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে দেখেছি ১৯৩০এর দশকে কলকাতায় ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরদারিতে থাকা ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোংএর মালিক বীরেন দাশগুপ্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে বসে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালানোয় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। এলসডর্ফ সক্রিয় হওয়ার দু'দশক আগেই জার্মান বিদেশ দপ্তর ভারততত্ত্ববিদ Helmuth von Glasenappএর সাহায্যে বীরেণ দাশগুপ্তর মত প্রবাসী ভারতবর্ষীয়দের সক্রিয় করে তুলে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালিয়েছে। এলসডর্ফের সঙ্গে গ্ল্যাসেন্যাপের পার্থক্য হল, প্রথজমজনের ভারতবর্ষীয় জ্ঞান নাজি রাজনীতির নানানস্তরে ব্যবহার করা হয়েছে।

হিটলার স্বাধীন ভারতবর্ষের দাবি মানলেন না। রিবেনট্রপ বিদেশ দপ্তরের 'ওয়ার্কিং গ্রুপ ইন্ডিয়া' থেকে কয়েকজন অনুগামী নিয়ে ১৯৪০ থেকেই ভারতবর্ষে সরকার বিরোধী প্রচার তুঙ্গে তুলতে Sonderreferat Indien (Special Office India, এখন থেকে SRI) তৈরি করেন। SRIএর কাজ হল কাগজ এবং রেডিও প্রচার। বিভাগের দায়িত্ব পেলেন বিশেষ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সচিব এবং SS থাকবন্দীর ওপরের স্তরের পদাধিকারী উইলহেলম কেপলার। দৈনন্দিন কাজ দেখার জন্যে নিয়োগ করা হল অক্সফোর্ড শিক্ষিত অভিজাত গোপন হিটলারপন্থী Adam von Trott zu Solzকে। ১৯৪১এর মে মাসে লুডইউগ এলসডর্ফকে মুনস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে লিয়েনে এনে SRIএর একাডেমিক এসিসট্যান্ট নিয়োগের চিঠি দেওয়া হল ৩ এপ্রিল ১৯৪১এ।

জার্মানি আর ফ্রান্সের প্রবাসী ভারতবর্ষীয়দের জুড়ে নেতাজীকে Free India Centreএর (এখন থেকে FIC) প্রধান করা হল। ঠিক হল FIC রেডিও, খবরের কাগজে প্রচার চালিয়ে অক্ষশক্তির বিজয়, নেতাজীর নানান কাজকর্ম সমর্থন আদায় এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া চালাবে। দায়িত্ব দেওয়া হল SRIকে। SRIএর কাজ হল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করে ভারতবর্ষকে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রচারের ঘনঘটা তৈরি করা। FICতে নেতাজীর সহকারী, সাংবাদিক, উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক A.C.N. Nambiar ১৯৪৭এ সুইজারল্যান্ডে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বিবৃতিতে জানান SRI আর FICর মধ্যে সংযোগ সেতু ছিলেন এলসডর্ফ। তাঁর ভারতবর্ষের জ্ঞান অবলম্বন করে SRI ভারতবর্ষ নিয়ে পাক্ষিক সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। SRI, ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত রিবেনট্রপ এবং বিদেশ দপ্তরের অন্য পদস্থ আধিকারকের জন্যে ভারতবর্ষে ঘটতে থাকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক/রণনৈতিক ঘটনাবলীর সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। বেশ কয়েকটায়

এলসডর্ফএর স্বাক্ষর করেছেন। SRIতে এলসডর্ফএর সহকর্মী ছিলেন প্রাক্তন সোসাল ডেমোক্রাট, শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা Franz Josef Furtwängler ফুর্টওয়াংলার (ফুর্টওয়াংলারের বর্ণময় জীবন বুঝতে পড়ুন (Ravi Ahuja, Marcel van der Linden, Anna Sailer (editor), The Distress is Impossible to Convey, British and German Trade-Union Repor - 'যে দুর্দশা বয়ান করতে জান ফেটে যায়' ১৯২৬-২৮, দুবছর ভারতবর্ষের মিলগুলো ঘুরে, যে মিল নিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের নেতারা রোমান্টিসাইজ করেন, ব্রিটিশ-জার্মান শ্রমিক নেতারা যে শ্রমিক দুর্দশা দেখেছিলেন, সেই দলে ছিলেন ফুর্টওয়াংলারও। এছাড়াও পড়তে পারেন এলিজাবেথ বড়ুয়া, নিরদ কুমার বড়ুয়ার ফ্রাঞ্জ যোসেফ ফুর্টওয়াংলার এন্ড ইন্ডিয়া)। এলসডর্ফএর মত ফুর্টওয়াংলারও ভারতবর্ষে এসেছেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখেছেন এবং বিদ্যায়াতনিক চর্চার বাইরে ভারতবর্ষ বিষয়ে হাতেকলমের বিশেষজ্ঞরূপে প্রভূত খ্যাতিও পেয়েছেন। এইসব সমীক্ষা এবং মেমোরান্ডা ব্যবহার করা হয়েছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জার্মান রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে এবং জার্মানি নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন দেশের সংবাদ জগতের খবর আর জনমত তৈরিতে। নাৎস্বিয়ারের দাবি বিদেশ দপ্তরের সংবাদ বিভাগের সচিব Hilmar Baßler দূর প্রাচ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এই দপ্তরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনা তৈরি করতেন এলসডর্ফ।

এলসডর্ফের লেখা রিপোর্ট আর মেমোরান্ডা পাঠে বোঝা যায়, সেই মুহূর্তে জার্মানির কাছে ভারতবর্ষের কোন কোন বিষয় রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল - গুরুত্বপূর্ণ ছিল কংগ্রেস আর নেতারা, গান্ধী ছিলেন প্রথমতম আকর্ষণ। এলসডর্ফ কংগ্রেসের প্রথমসারির ডান, বাম এবং মধ্যপন্থী নেতার কাজকর্ম নিয়ে নজরদারি চালিয়েছেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেসের 'কংগ্রেস-সোসালিস্ট' গোষ্ঠীকেও গুরুত্ব দিতেন। তাছাড়া হিংসা ছড়ানো বিপ্লবী জঙ্গীবাদীদের নিয়ে লিখেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের ওপর প্রভাব এবং যুদ্ধে ভারতবর্ষের বৈশ্বয়িক অবস্থা বুঝতে। এলসডর্ফ আর ফুর্টওয়াংলার ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বাড়িয়ে চড়িয়ে দেখিয়েছেন। এলসডর্ফএর রিপোর্টগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নানান ঘটনাক্রমকে জার্মান মিডিয়া কোন দৃষ্টিতে দেখবে, সেই গেজ নির্ধারণ করে দেওয়া।

বিদেশ দপ্তরের আরেকটা বড় মাথা ব্যথার ঘটনা ছিল পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা। গান্ধী আর নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ এবং বহুত্ববাদী ভারতবর্ষের পক্ষে ছিলেন, অন্যদিকে কংগ্রেস বিরোধী অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে অনড়। নেতাজীও নীতিগতভাবে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে, তিনিও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্র তৈরির বিপক্ষে রায় দেন। তাঁর অবস্থান ছিল ভারতবর্ষে জার্মানির ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারে যেন ধর্মের জায়গা না থাকে এবং তিনি

স্পষ্টভাবে পাকিস্তান তৈরির দাবির বিরোধিতা করেন।

নেতাজীর রাজনৈতিক অবস্থান নাজি সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মাথাব্যথা বাড়াল। যুদ্ধকালীন সময়ে নাজি রণনীতি ছিল বিশ্বজুড়ে মুসলমান সমাজের সমর্থন আদায় (প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, ১৯৩২এ আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে নাজিরা সংগঠন তৈরি করেছে - অনুবাদক)। প্রচারে প্রভূত ইসলামি বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করত হিমলারের দফতর। এলসডর্ফ এ ধরণের প্রচারনথি লিখেছেন। ১৯৪১এর ২ ডিসেম্বরে স্বাক্ষর করা এক নথির শীর্ষক ছিল 'ভারতীয় মুসলমান, পাকিস্তান পরিকল্পনা, প্রাচ্যে জার্মান রাজনীতি।' নথিতে এলসডর্ফ ভারতবর্ষের ৯ কোটি মুসলমানের সমর্থন আদায়ের কথা বললেন। তাঁর বক্তব্য জার্মানির মধ্য এশিয়া এবং নিকট প্রাচ্যের রণনীতি তৈরিতে ভারতবর্ষের ৯ কোটি মুসলমানের সমর্থনের ওজন বিশ্বরাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ - যদিও এটা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিষয়, তিনি এ বিষয়ে বেশি বাক্য ব্যয় করতে চান না।

SRIএর পক্ষে কেপলার নথিটা বিদেশ মন্ত্রকে পাঠিয়ে দেন। হয়ত এই নথিরই প্রভাবে ১৯৪২এ জার্মান প্রচার যাতে মুসলমান ধর্মকেন্দ্রিক না হয়, সে বিষয়ে রিবেনট্রপের দপ্তর থেকে অধ্যাদেশ জারি হয়। এলসডর্ফ আবার ১৯৪৩এর মে মাসে যখন এই বিষয় নিয়ে লিখছেন, ততদিনে নেতাজী জার্মান ছেড়ে পূর্ব এশিয়ায়। তবে বিদেশ দপ্তরের Wilhelm Melchersএর মত আধিকারিকদের উল্টো বক্তব্য হল পাকিস্তান আন্দোলনে জার্মানির নিশ্চুপ থাকা আরব দেশগুলো ভালভাবে নেবে না। তারা সমগ্র শক্তি নিয়ে এই আন্দোলনের পাশে রয়েছে।

কিন্তু কেপলার নেতাজীর দেখানো নীতির সমর্থনে দাঁড়াতে তাঁর মন্ত্রীকে রাজি করালেন। কেপলারের অবস্থানকে জোরদার করতে এলসডর্ফ ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের বিষয় নিয়ে আরও কিছু নথি তৈরি করলেন। এই নথিগুলোয় জোর দেওয়া হল, কেন নাজি রাষ্ট্রের পক্ষে পাকিস্তানের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ হবে না। তিনি বললেন ভারতবর্ষে লিগ গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এ কথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই, লিগ যে ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধি নয়, এ কথাও বলতে হবে। ১৯৪৩এর ৬ মে'র নথির বিষয় ছিল জার্মান সংবাদ জগতকে এই লাইনে কীভাবে আনা যাবে। এই নির্দেশাবলীর একটা বিষয় ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থনে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী পাকিস্তান আন্দোলন ভারতবর্ষের মাটিতে চলছে, জার্মান মিডিয়া যেন সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে। ১৯৪৩এর ৬ মে'র নথিতে বললেন ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু, মুসলমান পাকিস্তান দাবির বিরোধী। তাদের পাশে দাঁড়ানো নাজি জার্মানির প্রতি তারা কৃতজ্ঞ থাকুক। এলসডর্ফ তারিখবিহীন, হয়ত কাছাকাছি সময়ে লেখা নথিতে

দাবি করলেন Pakistan, the Indian Ulster। তিনি নাজি প্রচার নস্যাৎ করে বললেন পাকিস্তানে মুসলমানেরা আয়ারল্যান্ড আর ফিলিস্তিনে মুসলমানদের মত ভিক্টিম হবে। নাজি দুই নেতার মধ্যে পাজিস্তান আন্দোলন নিয়ে হাল্কা আকচাআকচি চলতেই থাকল।

মতপার্থক্য মেটাতে ইন্ডিয়া কমিটিকে মাঝে রেখে প্রাচ্য দফতর আর SRI বৈঠক হল ১৯৪৩এর ২০ মে। আপসরফায় সিদ্ধান্ত হল জার্মান প্রচারযন্ত্র সরাসরি মুসলমান মানসিকতায় আঘাত করতে যেমন লিগের আন্দোলনের সমালোচনা করবে না, তেমনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকেও সমর্থন করবে না। আমরা দেখলাম নাজি জার্মান রাষ্ট্রের উপনিবেশিক ভারতবর্ষ নিয়ে নীতি কি হবে, সেই পথনির্দেশনায় এলসডর্ফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

মাথায় রাখতে হবে এলসর্ফের পণ্ডিতি কাজকর্মের একটিমাত্র উদ্দেশ ছিল নাজি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সূত্র খুঁজে বার করা। তবে এলসডর্ফএর পড়াশোনার ভিত্তি যেহেতু ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশিক ইতিহাসচর্চা এবং বৈদিক আর্যতত্ত্ব নির্ভর ভারতরতত্ত্ব, উত্তরাধিকার সূত্রে তার মানসিক অবস্থান অনেকটাই ইসলাম-বিদ্বেষের। ইন্ডিয়েন বইতে তিনি বেশ কয়েকবার 'মুসলমান ধর্মান্ধতা', 'ভারতীয় মুসলমানেরা তুর্কিদের মত হিংস্র, কম বৌদ্ধিকতা সম্পন্ন' শব্দবন্ধ লিখেছেন।

যুদ্ধের পরে নাম্বিয়ারের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী, অক্ষশক্তির বন্ধু, ভারতবর্ষ নিয়ে ইতালির প্রচার নীতি তৈরি করা জামিল আহমাদ খানের সঙ্গে SRI এর যোগাযোগ করাতেন এলসডর্ফ। ইতালির ফ্যাসিস্ট প্রচারযন্ত্র পাকিস্তান তৈরি পক্ষে দাঁড়িয়ে ধর্মীয় শব্দবন্ধ ব্যবহার করত। এলসডর্ফের সেই ইসলামপক্ষীয় প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করার নিদর্শন নেই।

১৯৪৪এর অক্টোবরে এলসডর্ফ লিখলেন ব্রিটিশ সমর্থিত পাকিস্তান আন্দোলনে গান্ধীর কড়া বিরুদ্ধতা জার্মান স্বার্থ সিদ্ধি করবে। এই বিষয়ে ব্রিটিশ আর ভারতীয়রা যদি একটা আপোষ মিমাংসায় উপনীত হয়, সেটাও জার্মানদের সুবিধে করে দেবে। আলসডর্ফ তার জ্ঞানকে বাস্তবের উপযোগী করে ব্যবহার করেছেন, আরও একবার নাজি রাজনীতিতে তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন।

SRIতে তিনি নাজি রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক দায়িত্বই শুধু পালন করেছেন এমন নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বিদেশ মন্ত্রক আর বার্লিনের ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন মিলে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার যে পরিকল্পনা করেছিল, সেই বিপ্লব পরিকল্পনা আফগান আদিবাসী অঞ্চলে নতুন করে আয়োজন করে নাজি সেনার Wehrmacht (Armed Forces)র গোপন বাহিনী Abwehr অপারেশন টাইগার নামে। সে আয়োজন ব্যর্থ হয়। এই পরিকল্পনার সঙ্গে জুড়েছিলেন আলসডর্ফ। নেতাজীকে পরিকল্পনায় অংশ নিতে আহ্বান জানান। ১৯৪১এ ১১

আগস্ট নেতাজীর সঙ্গে Wehrmacht, Abwehrএর মুখপাত্র, SRIএর পক্ষে এলসডর্ফ আর ট্রট বৈঠক করেন। মাঝেমধ্যে এলসডর্ফ সরাসরি কাবুলের জার্মান দূতের দপ্তর (German Legation) আর বার্লিনেরর বিদেশ দপ্তরের মধ্যে বার্তা বিনিময়ের সঙ্গে জুড়ে থাকতেন। ১৯৪৪, বা হয়ত তার আগেও, তিনি বার্লিন থেকে সাংকেতিক ভাষায় কাবুলে বার্তা পাঠিয়েছেন। পূর্ব এশিয়ায় থাকা নেতাজীর সঙ্গে ভারত উপমহাদেশে ভগতরাম তলোয়ার, যার সাংকেতিক নাম ছিল রহমত খান বা RK, যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। আলসডর্ফএর আরও একটা প্রাক্টিক্যাল দায়িত্ব ছিল Wehrmacht আর নেতাজীর দলের সঙ্গে তৈরি যৌথ বাহিনী Indian Legion বা Infantry Regiment 950এর সঙ্গে বিদেশ দপ্তরের যোগাযোগ রাখা। এই বাহিনীর সেনারা ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর হয়ে উত্তর আফ্রিকায় অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ধরা পড়া ভারতবর্ষীয় যুদ্ধবন্দীরা। সেনা গুরবচন সিংহ মঙ্গত স্মৃতিকথায় বলেছেন বার্লিনের এক রেস্তোঁরায় ল্যান্স কর্পোরালস্তরের পোষাক পরা আলসডর্ফ ভারতবর্ষীয় সেনাদের স্বচ্ছন্দ টানহীন হিন্দুস্তানিতে স্বাগতম জানাতেন। তিনিই সেনাদের ট্রটের মত বিদেশ দফতরের আধিকারিকের সঙ্গে আলাপ করান।

মিডিয়াকে দিক নির্দেশিকা দেওয়ার পাশাপাশি এলসডর্ফ ভারতবর্ষের পাঠকদের জন্যে প্রচার প্রবন্ধ, পুস্তিকা লিখেছেন। বার্লিনের প্রচার পুস্তিকা প্রকাশক Walter Titz Verlag থেকে এলসডর্ফ ‘স্বাধীনতার পথে ভারতবর্ষ’ নামে ছোট পুস্তিকা বোথো লুডউইগ ছদ্মনামে প্রকাশ করে ১৯৪২এ। বইতে গান্ধীর কিছুটা প্রশংসা করা হলেও, মূল লক্ষ্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অতুলনীয় অগ্রগামী জাতীয়তাবাদী চরিত্র নির্মাণ। বইএর শেষে বলা হয়েছে ভারত স্বাধীন হবেই, ‘কোনও জনগনই সঙ্গীনের ওপর বসতে পারে না, কারন সারা বিশ্বেই সঙ্গীনের প্রয়োজন অনুভূত হয় (নাজিরা ভুলে গিয়েছিল এই বাক্যটা তাদের ক্ষেত্রেও কোনও না কোনও দিন প্রযোজ্য হবে)।’ ২৫ আগস্ট ১৯৪২এ Berliner Börsen Zeitung প্রকাশনায় Indien kämpft, ভারতবর্ষের লড়াই, বইতে লিখলেন ‘ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতীয়দের ফুয়েরার, গান্ধীকে বন্দী করেছে। ভারতবর্ষের প্রজারা তাকে ভগবান মানে। তিনি পতনন্মুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রাণপন লড়ছেন।’

ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার, FIC

যুদ্ধ শেষে সুভাষ চন্দ্র বসুর সচিব, ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার, FICর অন্যতম পরিচালক মুকুন্দ রাই ব্যাস বার্নসউউক জেলে ১৯৪৫এ ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের জানিয়েছিলেন ১৯৪৪এর ২০ জুলাই হিটলারের জীবননাশের অভিযোগে ট্রট হত্যার পর এলসডর্ফই SRIর প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়েছেন। নাম্বিয়ারের দাবি, ১৯৪৪এর জুলাই থেকে এলসডর্ফই ছিলেন কেপলারের প্রধান সহকারী। তাঁর কাছেই FIC নিয়ে সমস্ত তথ্য

থাকত এবং সুদূর প্রাচ্যে নেতাজীর সঙ্গে এলসডর্ফই যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৪৩এ মিত্রপক্ষের বোমা থেকে বাঁচতে FIC যখন হল্যান্ডের Hilversumএ স্থানান্তরিত হল, তখন FIC আর SRIএর মধ্যস্থ হিসেবে বহুবার FIC দপ্তরে গিয়েছেন এলসডর্ফ। তিনি শেষবারের মত FIC গিয়েছেন ১৯৪৫এর শুরুতে। ততদিনে FIC Bavariaর Helmstadtএ এসেছে। FICতে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে লড়াই করা ভারতবর্ষীয় সেনাদের অক্ষ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আবেদনওয়ালা গোছাগোছা প্রচারপত্র নিয়ে যেতেন; এই প্রচারপত্রর পরিকল্পনা ছিল ইতালির জামিল আহমাদ খানের। নাজি জার্মানির পতনের দিনগুলোতেও এলসডর্ফ তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই প্রকাশ

বিভিন্ন জার্মান সঙ্গঠনের যাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশ্ববিক্ষ্যা গড়ে ওঠে, ১৯৪২এর ২৩ জানুয়ারি ট্রট লিখলেন that would provide a clear source of information relevant to external politics for all the organisations that had something to do with India সে জন্যে SRI ভারতবর্ষ সম্বন্ধে India through individual portrayals শীর্ষকে বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। এলসডর্ফ মুখবন্ধে লিখলেন, ‘বইগুলো প্রকাশের উদ্দেশ্য, বিশ্বকে জানানো যে জার্মানি সত্যিকারের ভারতবর্ষ বিষয়ে গভীরভাবে উৎসাহী।’ ঠিক হল এই বইগুলি যেহেতু জার্মানি-ভারতবর্ষের মধ্যে যৌথ সম্পর্কের ফসল, তাই মোট আটখানি বইএর মধ্যে চারটি জার্মান পণ্ডিত লিখবেন বাকিগুলো ভারতবর্ষীয়রা। সিরিজ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল Furtwänglerকে। হাইডেলবার্গের দক্ষিণপন্থী প্রকাশক Kurt Vowinckelই আটটি বই প্রকাশের দায়িত্ব পেল। বই আর লেখকেরা হলেন Hermann Beythan: What is India (Was ist Indien); Hermann Lufft: The Indian Economy (Die Wirtschaft Indiens); Koodavuru Anantrama Bhatta: India in the British Empire (Indien im Britischen Weltreich); Mukund Rai Vyas: Men and Political Parties in Today’s India (Männer und Mächte in heutigen Indien); Abid Hassan: Islam in India (Islam in Indien); Abdul Quddus Faroqhi: The Social Question in India: (Die Soziale Frage in Indien); Ludwig Alsdorf: The Spiritual Connections between Germany and India (Deutsch-indische Geistesbeziehungen); Wilhelm Kruse: Monuments in Indian Art (Denkmaler Indischer Kunst)।

শুরুতেই প্রকল্প লাটে উঠল। ভারতবর্ষীয় লেখকদের পাণ্ডুলিপি এলসডর্ফএর

নির্দেশে কাজ করা Furtwänglerএর পছন্দ হল না। ভট্ট, ব্যাস আর হুসেনকে না জানিয়ে, এলসডর্ফ তাদের সম্মতি না নিয়ে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করলেন। এই বিষয়ে নেতাজী অভিযোগ করলে, এলসডর্ফ আর Furtwänglerএর ভাষায় the fiction of the principle of parity বাহানায় প্রকল্প বাতিল করা হল। ফারুকির পাণ্ডুলিপি অবিকৃত অবস্থায় ফেরত এল। Hermann Beythanএর নামে একটা বই প্রকাশিত হল। বার্লিনে নাজি সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা Devendra Nath Bannerjeaর গান্ধীকে নিয়ে লেখা বই এলসডর্ফ বাতিল করলেন। প্রতিশোধ নিতে Devendra Nath অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন বামপন্থী শ্রমিক নেতা Furtwängler হিটলারের হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িত, তাকে বাঁচাতে এলসডর্ফকে আসরে সশরীরে নামতে হল।

এলসডর্ফই নেতাজীর লেখা দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ আটকে দিয়েছিলেন। নেতাজীর ইচ্ছে ছিল বইটি জার্মান ভাষায় প্রকাশ পাক। বিদেশ দপ্তরের ছাড়পত্রও জোগাড় করেছিলেন। ১৯৪২এর ২০ সেপ্টেম্বরের কেপলারকে পাঠানো মন্তব্যে জানালেন বইতে তাঁর আন্দোলনের বিশদ বর্ণনা জার্মান পাঠককে বিরক্ত করবে। তাছাড়া বইতে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পোলেমিক বিতর্কের আভাষ আর প্রতিপদে গান্ধীর আন্দোলনের ব্যর্থতার সমালোচনা আছে। বই প্রকাশ হলে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে খারাপ বার্তা যাবে। এই বইএর বিষয় ভারতবর্ষ নিয়ে জার্মান কূটনৈতিক অবস্থানের বিপরীত। বই পড়ে যেন মনে হচ্ছে জার্মানি মহাত্মার বদনাম করতে চাইছে। ব্যাস জানাচ্ছেন ১৯৪৪এ এলসডর্ফকে বইএর খসড়া সংশোধনী তৈরি করলেও প্রকাশিত হয় নি। এই ঘটনা প্রমান করে SRIএর ওপরে এলসডর্ফএর প্রভাব এবং নাজি রাষ্ট্র বেশ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তার পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এই সিরিজে এলসডর্ফ লিখলেন 'জার্মানি, ভারতবর্ষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক Deutsch-indische Geistesbeziehungen। নাজি দলের বিজ্ঞান বিভাগের Wissenschaftএর সদস্য Erxleben ২২ মে ১৯৪২এর মন্তব্য করলেন এর প্রচারমূল্য অসীম। এলসডর্ফ বইতে দাবি করছেন ১৯৩৩এর ভার্সাইএর অসম, অযৌক্তিক চাপিয়ে দেওয়া চুক্তির ফলে জার্মান আর উপনিবেশিক ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কিন্তু লেখকের আধিপত্যবাদী স্বর লুকোনো যায় নি, 'জার্মান চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ফল পেতে যেমন প্রত্যেকটি দেশের জার্মান ভাষা শেখা উচিৎ তেমনি ভারতবর্ষের জনগণের নিজেদের কৃষ্টি ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য এবং ভাষা বিষয়ে গবেষণা করতে জার্মান ভাষা শেখা উচিৎ।' বইএর বক্তব্য, ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষ লুঠ করেছে, কিন্তু জার্মানদের উদ্দেশ্য তার আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক সম্পদ রক্ষা, যে কাজটা তারা অতীত থেকে করে আসছে। এই বই সূত্রে আদতে

এলসডর্ফ, জার্মানির ভারততত্ত্ববিদ্যার সুপ্ত বিজয় গাথা লিখলেন; জার্মান নেতাদের, নাজি রাষ্ট্র নির্মাণের জাতীয়তাবাদী প্রকল্প হিসেবে ভারততত্ত্ববিদদের অবদান পরোক্ষে স্মরণ করিয়ে জার্মান একাডেমিয়ার সম্মান উচ্চে তুলে ধরলেন।

Aktion Ritterbusch

জার্মান ভারততত্ত্ববিদদের অবদান চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ১৯৪২এ এলসডর্ফ Aktion Ritterbusch বা রিটারবুশ একশন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত হলেন। এই টি হল ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মান ইউনিভার্সিটিগুলোর মানবিকবিদ্যা বিভাগের, যুদ্ধ উদ্যমে তাদের মত করে জার্মান পণ্ডিত পল রিটারবুশের নেতৃত্বে অংশ নেওয়া - শব্দযুদ্ধে বিশ্বের সামনে পশ্চিমি, মূলত ফরাসি আর ব্রিটিশ চিন্তাধারার বিপক্ষে জার্মান স্পিরিট আর জার্মান বিজ্ঞান Wissenschaftenএর উচ্চমন্যতা দেখানো। প্রকল্প সফল করতে ১৯৪২এর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বার্লিনে প্রাচ্যবিদদের সম্মেলনে এলসডর্ফ উপস্থাপন করলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম Die Indische Freiheitsbewegung। তার বক্তব্যটি ১৯৪৪এ প্রাচ্যবিদ Die Indische Freiheitsbewegungএর সম্পাদনায় প্রকাশি বইতে অন্তর্ভূক্ত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি নাজি রাষ্ট্রের সামনে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের মর্ম বুঝতে জার্মান ভারততত্ত্ববিদদের দক্ষতা অসামান্য চাতুর্যে তুলে ধরেন।

ভারততত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক অধ্যাপনা

১৯৪২এ দুটি পেশাদারি পদের জন্যে মনোনীত হলেন আলসডর্ফ। এই ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যায়, নাজি একাডেমিক রাজনীতির আকাশে তাঁর উল্কাসম উত্থান। মিউনিখে আলফ্রেড রোজেনবার্গের Hohe Schule আক্ষরিক অর্থে হাই স্কুলে অধ্যাপনার জন্যে বাছা হল; আর বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ১৯৪০এ প্রতিষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি ফর দ্য স্টাডিজ অব দ্য ফরেন কান্ট্রিজ Auslandswissenschaftliche Fakultät বা AFতেও তিনি মনোনীত হলেন। তাকে AFতে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হল।

কিন্তু আলফ্রেড রোজেনবার্গ হতাশ হলেন না। আলসডর্ফকে পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে বার্লিনে নাজি পার্টির চ্যান্সেলারিতে অফিসিয়াল চিঠি লিখে বললেন আলসডর্ফ আদ্যপান্ত একাডেমিক পণ্ডিত; তার দক্ষতা ‘মহান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ’ বিষয়ে। এই তাত্ত্বিক বিষয়ে আরও গভীর গবেষণার জন্যে তাঁর দক্ষতা নাজি রাষ্ট্রের কাজে লাগানো উচিৎ। কিন্তু AF তৈরি করেছিল বিদেশ দপ্তর, শিক্ষামন্ত্রক এবং SS যৌথভাবে। রাষ্ট্র থাকবন্দীত্বে তাদের ক্ষমতা অনেক বেশি। তারা মনে করছিল আলসডর্ফের বর্তমান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান নাজি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষায় রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা অনেক বেশি জরুরি। একদিকে নাজি মতাদর্শের বৈধতা

দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ বিষয়ক জ্ঞানের চাহিদা, অন্যদিকে নাজি রাষ্ট্রের টিকে থাকার বাস্তব রাজনীতি Realpolitikএর লড়াইতে উপনিবেশিক ভারতবর্ষের বাস্তবিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার টানাপোড়েন থেকে প্রমান হয় নাজি রাষ্ট্রে ভারত বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান প্রয়োগের অনেকগুলো সম্ভাবনার দ্বার তৈরি হচ্ছিল।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উদ্ভুত নাজি বিদেশ দপ্তরের নির্দিষ্ট চাহিদা মোকাবেলার জন্যে বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে AF আর Deutsche Auslandswissenschaftliches Institut, DAWI তৈরি হয়। AFএর লক্ষ্য ছিল প্রশিক্ষণ, আর DAWI ফোকাস গবেষণা, প্রকাশনা। দুটি সঙ্গঠনই রাজনৈতিকভাবে দরকারি জ্ঞানান্বেষণকে প্রাধান্য দিয়েছে। AFএর ডিন আর DAWIএর ডিরেক্টর Franz Alfred Six ছিলেন প্রিন্ট মিডিয়া স্টাডিজ Zeitungswissenschaftএর অধ্যাপক, SS আর SDর সদস্যও। ১৯৪৩ সিক্স বিদেশ দপ্তরের কৃষ্টি রাজনৈতিক বিভাগ আর SRIএর প্রধান হন।

SRIএর প্রধান হওয়ার অনেক আগে থেকেই সিক্স AFএ আধুনিক ভারতবর্ষ বিষয়ক অধ্যাপক ছিলেন। তার দপ্তরে আলসডর্ফের যোগ দেওয়াই স্বাভাবিক। ১৮৪২এর ১৬ জানুয়ারি সিক্স লিখলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষের সে দিন আসন্ন, আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে ডিল করতে হবে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে নাজি পার্টির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল আধুনিক স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন।' এই খোঁজে নাজি পার্টিতে সামনে একমাত্র আলসডর্ফএরই নাম উঠে এল; তার একটা বড় কারন তিনি ততদিনে ফুয়োরারের প্রিয় ইন্ডিয়েন বই লিখেছেন।

১৯৪২এ আলসডর্ফকে 'ভারতবর্ষের ভূমি আর জনগণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার নির্দেশ আসে, তখনও তার নামে AFএ অধ্যাপনার ছাড়পত্র আসে নি। তাঁর পদ হল লেকচারার পদের সমতুল Außerplanmäßger Professor আক্ষরিক অর্থে অসাধারণ অধ্যাপক। আলসডর্ফএর অধ্যাপনার প্রথম জীবনে নাজি অধ্যাপক সমিতি NSDB তাকে নাজি মতাদর্শের অনুপযুক্ত দাগিয়ে দিলেও, এবারে তারা তার চাকরির ছাড়পত্র দিতে মুক্তহস্ত। ১৯৪২এর ফ্রেব্রুয়ারিতে পদে যোগ দেওয়ার অনুমোদন মিলল। ১৯৪১এর নভেম্বরে ইউনিভার্সিটি অব মুনস্টার আলসডর্ফকে অসামান্য বই, ইন্ডিয়েন লেখার স্বীকৃতি স্বরূপ Außerplanmäßger Professor পদে বরণ করল। ডিনের চিঠিতে তার জৈন গবেষণার থেকে অনেক বেশি বাহবা পেল উপনিবেশিক ভারতবর্ষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান।

শুরুর সময়ে আলসডর্ফ AFএ যোগ দিতে উৎসাহ পাচ্ছিল না। ১৯৪২এর মাঝামাঝি বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট তৈরির আবেদন করে আলসডর্ফ। তার যুক্তি ছিল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট, বৈদেশিক মন্ত্রককে গবেষণার মাধ্যমে ভারতবর্ষের রাজনীতি বুঝতে সাহায্য করবে। একে SRIএর সঙ্গেও জুড়তে হবে। তার যুক্তি যুদ্ধের সময় এ ধরণের গবেষণা সংগঠনের সক্রিয় হওয়া খুবই জরুরি।

কিন্তু সিক্স রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে আলসডর্ফের প্রকল্পে জল ঢেলে দেন। ১৯৪৩এ AFএ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'ভারতবর্ষের জনগণ এবং এরিয়া স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠিত হয়, আলসডর্ফ সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ Indische Realien সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ১৯৪৪এর এপ্রিলে তাঁকে Außerplanmäßger Professor বরণ করে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে তিনি DAWIএর ভারতবর্ষ বিষয়ক গবেষণা সংগঠনের প্রধান হলেন। এই ঘটনাক্রম থেকে আরেকটা বিষয় পরিষ্কার SS বা অন্য কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থন ছাড়া, গবেষক যতই নাজি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেশ করুক না কেন, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ১৯৪৩-৪৪এর শীত সেমিস্টার পর্যন্ত তিনি AFএ অধ্যাপনা করেন, তারপরে বম্বিংএর আশংকায় আজকের চেক দেশের Krummhübelএ গোটা সঙ্গঠনই উঠে যায়।

যুদ্ধ শেষে পরাজিত নাজিবাদ অক্ষয় হল

যুদ্ধ শেষে AF আর DAWI ভেঙে দেওয়ায় আলসডর্ফ বেকার হলেন। ১৯৭৮এ মারা যাওয়ার পর ছাপানো অবিচুরিতে বলা হয়েছে বেকার থাকার সময় তিনি রাইনল্যান্ড প্যালেটিনেটের গ্রামে আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করতেন। ১৯৪৮এর তার প্রাক্তন কর্মক্ষেত্রে মুনস্টার ইউনিভার্সিটিতে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন।

এই সময়টুকুতে তার জীবনের খুব বেশি সংবাদ পাওয়া যায় না, বোঝা যায় তিনি নতুন সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সফলও হচ্ছেন। নাজি সংগঠন NSDAPর সদস্যপদের অর্থ ছিল ডিনাজিফিকেশনের (Entnazifizierung) আইনি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাত্রা করা - চতুর্থ শ্রেণীর রাজনৈতিক দোষে দুষ্ট Mitläufer (fellow traveller)। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তার জার্মান শিক্ষা জগতে ফেরা খুবই কঠিন হল। ১৯৪৭এর সেনা সরকার তাকে মুনস্টার ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর অনুমতি দিলেও North Rhine Westphaliaএর (NRW)

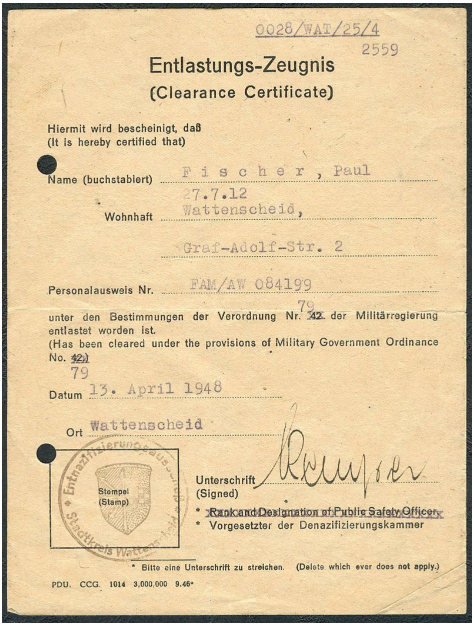
0028/WAT/25/4
2559

Entlastungs-Zeugnis
(Clearance Certificate)

Hiermit wird bescheinigt, daß
(It is hereby certified that)

Name (buchstabiert) F i s c h e r , Paul
27.7.12
Wohnhaft Wattenscheid,
Graf-Adolf-Str. 2

Personalausweis Nr. FAM/AW 084199

unter den Bestimmungen der Verordnung Nr. ~~42~~ 79 der Militärregierung entlastet worden ist.
(Has been cleared under the provisions of Military Government Ordinance No. ~~42~~) 79

Datum 13. April 1948

Ort Wattenscheid

Stempel (Stamp)

Unterschrift (Signed)
* ~~Rank and Designation of Public Safety Officer.~~
* Vorgesetzter der Denazifizierungskammer

* Bitte eine Unterschrift zu streichen. (Delete which ever does not apply.)

PDU. CCG. 1014 3,000,000 9.46*

যুদ্ধশেষে ১৯৪৮এর একটি ডিনাজিফিকেশন শংসাপত্র

১৯৪৭এর নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালিয়া রাজ্যের নির্বাচনের একটি পোস্টার। স্লোগান, দ্রুত এবং ন্যায্যভাবে ডিনাজিফিকেশনের জন্যে ভোট দিন সিডিইউকে

শিক্ষা, কৃষ্টি মন্ত্রক তাকে কাজে নিতে উৎসাহ দেখায় নি। পূর্ব জীবনের রাজনৈতিক দায় বয়ে বেড়াতে হয়েছে, ১৯৪৮এ মুনস্টার ইউনিভার্সিটি তার অধ্যাপনা পদে ফিরে আসার সম্ভাব্য সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করেছে। তবে ইউনিভার্সিটি, আলসডর্ফের অধীত দক্ষতা কাজে লাগাতে বন্ধ থাকা ভারততত্ত্ব বিভাগে খোলার কথা ভাবছিল।

মুনস্টার ইউনিভার্সিটির ফিলোজাফিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডিন বিধিবদ্ধভাবে ক্লাসিসিস্ট ফ্রাঞ্জ বেকম্যান Franz Beckmann নেতৃত্ববিহীন, বন্ধ হয়ে যাওয়া ভারততত্ত্ব বিভাগ খুলতে আলসডর্ফের অতিথি অধ্যাপক রূপে যোগ দেওয়ানোর প্রস্তাব পাঠালেন। ফ্রাঞ্জ বেকম্যান নাজি রাজনীতি করতেন। ১৯৪৩এ বলকান অঞ্চলে জার্মান সেনার কালচারাল সুপারভিশনের দায়িত্বে ছিলেন, অর্থাৎ সেনাকে জাতিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব বোঝাবার কাজ করতেন যাতে তারা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। ১৯৪৫এর রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের পুনর্বাসন নিশ্চিত করলেন। ফ্রাঞ্জ বেকম্যানের পদে আসা সরাসরি নাজি দলের সঙ্গে জুড়ে না থেকেও নাজি রেডিও প্রচার করা ঐতিহাসিক হারবার্ট গ্রুন্ডম্যান, উত্তরসূরীর প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি যেহেতু সরাসরি নাজি দলের অংশ ছিলেন না, তাই তাঁকে রাজনৈতিক দায়মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৪৮এর ১৩ এপ্রিল গ্রুন্ডম্যান North Rhine Westphaliaএর (NRW) শিক্ষা এবং কৃষ্টি মন্ত্রককে আলসডর্ফের পক্ষ নিয়ে কৌশলী চিঠি লিখলেন। নাজি আমলে রাজনৈতিকভাবে অভিযুক্ত আলসডর্ফএর ওপর চাপানো সমস্ত অভিযোগ লঘু করে, তার দায় মুক্তির আশ্চর্য কৌশলবদ্ধ পথ ছিল এই চিঠির বয়ান। চিঠিতে বলা হল

এই ব্যক্তি কেরিয়ার রক্ষার দায়ে বাধ্য হয়ে NSDAP আর NSKKতে যোগ দিয়েছে, না হলে তার আশংকা ছিল, নাজিরা তার অধ্যাপনা জীবন শেষ করে দেবে। তাকে বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে নাজি সঙ্গঠনগুলোয় যোগদান করার জন্যে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করেন Bernhard Breloer। এখানে একটা তথ্য মাথায় রাখা জরুরি, Breloer ১৯৪৭এ রুশ কারাগারে মারা যান। এই বয়ানের বিরোধিতা করা মৃত Breloerএর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের পরে পুনর্বাসনে আগ্রহী নাজি পদাধিকারিকরা একটা মিথ ছড়ায় SS আর SAএর তুলনায় NSKK রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই কম অপরাধী, লেসার ইভিল, তার সদস্যদের দায় কম। NSKKকে কম দুষ্কৃতি সংগঠন বানানোর কায়দাটা বুঝে নিয়ে, চিঠিতে NSKKর দায় কমের মিথের প্রতিষ্ঠা দিলেন। গ্রুন্ডম্যান চিঠিতে মিউনিখ ইউনিভার্সিটিতে আলসডর্ফের আবেদন উল্লেখ করে বললেন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন তাকে এই পথ বেছে নিয়ে NSKKতে যোগ দিতে বাধ্য করেছেন প্রয়াত Breloer। বাজি কাঠামোয় যোগ দেওয়ার পরে তার পক্ষে চাকরির শর্ত লঙ্ঘন করার সুযোগ ছিল না। পার্টি সংগঠন আর NSKKতে যোগ দিতে বাধ্য হলেও তার প্রার্থী গবেষণার মন আর পণ্ডিতি সততা রক্ষা করে ইন্ডিয়েনের মত প্রথম শ্রেণীর গবেষণা পুস্তক রচনা করেছেন যদিও বিদেশ দপ্তর এবং প্রচার দপ্তর একে ব্রিটিশচাঁটা Anglophile গালি দিয়েছিল। তাছাড়া তিনি SRIতে ২০ জুলাই ১৯৪৪ ঘটনার ভিক্টিম Adam von Trott zu Solzএর অধীনে কাজ করেছেন। ট্রটের ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল হিটলার থাকাকালীন পার্টির একশ্রেণীর আমরা উদ্যোগে তথাকথিত ডিনাজিফিকেশনের উদ্যমকে মিথে পরিণত করা।

চিঠির সঙ্গে Walther Schubring, Hans Heinrich Schaeder, Helmuth von Glasenapp, Franz Taeschner চার বিখ্যাত প্রাচ্যবিদের শংসাপত্র জুড়ে দেওয়া হল। এরা প্রত্যেকে দলে না হলেও নাজি রাষ্ট্র কাঠামোয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে ছিলেন। Franz Taeschner, NSDAPর সদস্য, নাজি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অপারেটর। তিনি ১৯৩৩এ হিটলারের নামে শপথপত্রে স্বাক্ষর করেন, যদিও তিনি নাজি দলে যোগ দেন নি। Walther Schubring আলসডর্ফকে ১৯৩৮এ মুনস্টার ইউনিভার্সিটিতে তাকে শংসাপত্র দেন। Schaeder ছিলেন Aktion Ritterbuschএর অন্যতম লেখক।

এই আলোচনা আমাদের চোখ আঙুল দিয়ে দেখায় ১৯৪৫এর পর নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রাচ্যবিদেরা আলসডর্ফের দায়মুক্তির পক্ষে স্বাক্ষর করে নিজেদের রাজনৈতিক দায়মুক্তি আর পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু করলেন। আলসডর্ফ আর তার স্যাঙাতদের নতুন 'ইতিহাসের রাজনীতি'র ধাক্কায় ১৯মে ১৯৪৮এ North Rhine Westphaliaর (NRW) শিক্ষা এবং কৃষ্টি মন্ত্রক তাকে মুনস্টার

ইউনিভার্সিটির অতিথি অধ্যাপকের আমন্ত্রণ পাঠাল। ২০ জুন থেকে পড়ানো শুরু করলেন আলসডর্ফ।

যুদ্ধোত্তর জার্মানির ডিনাজিফিকেশন প্রক্রিয়ার সাফল্যের ঢাকপেটানোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন আগেও উঠেছে (যেমন Karl Jaspers এর Die Schuldfrage বা The Question of [German] Guilt), এখনও তুললাম। মুনস্টার ইউনিভার্সিটি আলসডর্ফকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করতে এতই ব্যস্ত ছিল যে, ১৯৪৭এ নাজিদের তাড়ায় তুর্কিতে আশ্রয় নেওয়া ইহুদি ভারততত্ত্ববিদ ওয়াল্টার রুবেনের অধ্যাপনা পদে যোগ দেওয়ার মন্ত্রকের আবেদনপত্র বাতিল করে। ২১ জানুয়ারি ১৯৪৮এ গ্রুন্ডম্যান মন্ত্রককে লিখলেন ওয়াল্টার রুবেনের যোগ্যতা পূর্ণ অধ্যাপনাপদ প্রাপ্তি। কিন্তু এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটিতে সেই পদ খালি নেই। ইউনিভার্সিটি রুবেনের আবেদন স্বীকার করতে অপারগ।

নতুন করে পুরোনো নাজি চক্রের কার্যকর আবির্ভাব ঘটল। হাস্যকরভাবে গ্রুন্ডম্যানের রুবেনএর নাম অস্বীকার করার ভিত্তি ছিল আলসডর্ফের দেওয়া তথ্য। গ্রুন্ডম্যান আলসডর্ফের কাছে রুবেনের যোগদান করা নিয়ে সমীক্ষা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন - এবং আলসডর্ফ তার উত্তরে জানায় ইউনিভার্সিটিতে পদ খালি নেই। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার অন্তত ইউনিভার্সিটির ভারততত্ত্ব বিভাগে নাজি মানসিকতা যুদ্ধের পর ঢাকঢোল পিটিয়ে ডিনাজিফিকেশনের পরেও ধ্বংস হয় নি।

Walther Schubring ১৯৪৮এর এপ্রিলে মুনস্টার ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগকে চিঠি লিখে জানালেন জার্মান Wissenschaft বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি তৈরি করতে ভারততত্ত্ব বিপুল অবদান পেশ করেছে। আলসডর্ফকে নতুন করে পদে নিয়োগ করলে সে এই বিষয়কে নিত্যনতুন শিখরে পৌঁছে দেবে। তাছাড়া আলসডর্ফএর সঙ্গে যেহেতু বহু ভারতীয় পণ্ডিতের যোগাযোগ আছে, ইউনিভার্সিটি তার সেই যোগযোগটাও কাজে লাগাতে পারে। মাথায় রাখতে হবে ১৯৪৫এর পরে জার্মান পণ্ডিতেরা নিজেদের পুনর্বাসনের দর বাড়াতে ‘জাতীয় সম্মান’ ‘আন্তর্জাতিক যোগাযোগ’এর মত শব্দবন্ধ আখছার ব্যবহার করেছেন।

১৯৫০এ Schubring অবসর নিলে আলসডর্ফ ভারততত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে হামবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। ১৯৭২এ অবসর নেওয়া পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে ২২ বছর একটানা কাজ করবেন। ততদিনে তিনি ভারততত্ত্বচর্চায় বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন।

১৯৭৮এ অবিচুরিতে তাঁর জৈন স্টাডি আর ১৯৪৫এর পরের সময়ের কাজকর্মেরই শুধু হদিশ দেওয়া হয়েছে - নাজি সময়ের সব কাজের সূত্র ভ্যানিশ। নাজি আমলের লেখাপত্রের উদাহরণ কয়েকটি নিরীহ লাইনে সেরে ফেলা হয়। সেই

অবিচুরিতে বলা হল আলসডর্ফ উপনিবেশিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনটে বই লিখেছিলেন নাজি রাজনৈতিক বৃত্তকে তথ্য যোগান দেওয়ার জন্যে - কিন্তু তিনি সচেতনভাবে থার্ড রাইখের তাত্ত্বিকতার অংশ ছিলেন না। এইভাবে নাজি আমলে উপনিবেশিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলসডর্ফএর সমস্ত লেখা সরিয়েফেলা হল।

বৈজয়ন্তী রায়, নলেজ অব ইন্ডিয়া এজ এন ইন্সট্রুমেন্ট অব নাজি পলিটিক্স; লুডউইগ এলসডর্ফ, জার্মান ইন্ডোলজি এন্ড ইন্ডিয়ান কলোনিয়ালিজম

হাকেনক্রুজ, স্বস্তিকা এবং ক্রিসেন্ট
নাজি প্রচারে হিন্দু মুসলমান আর বৌদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন

বৈজয়ন্তী রায়

১৯৯০এর দশকের পরে আন্তর্জাতিক ইতিহাসচর্চা পদ্ধতিগত হাতিয়ার হিসেবে জাতিকেন্দ্রিক ইতিহাস লেখার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ফ্যাসিবাদ, নাজিবাদ বিষয়েও একই কথা বলা যায়। ঐতিহাসিকেরা নাজি এবং ফ্যাসিবাদীদের তাত্ত্বিক অবস্থান বুঝতে মানুষের পরিযায়িতা, সীমান্ত টপকানো জ্ঞান, আর্থিক বিনিয়োগ, পণ্যের যাতায়াতের ইতিহাস বুঝতে চাইছেন। খুব সম্প্রতি এই ধরণের আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ায় প্রোপাগান্ডা এবং জনগণের মতকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও বোঝার উদ্যম নেওয়া হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিদেশে নাজি তত্ত্ব প্রচারের ভিত্তি ছিল কালচারাল পলিটিক্স Kulturpolitik। কালচারাল পলিটিক্স অর্থে ভাষা, শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মত সম্পদ সম্বল করে বিদেশে প্রচার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হারের পরে জার্মানি বিশ্বজুড়ে যে রাজনৈতিক প্রভাব হারিয়েছিল, সেই হারের বিপ্রতীপে এই ধরণের সফট পাওয়ার নিয়ে সে বিশ্বজুড়ে নতুন করে আধিপত্য তৈরি করার প্রচেষ্টা নেয়।

যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জুড়ে যাওয়ায় নাজি দল এবং নাজি সরকার বিদেশে তেমন প্রচার চালানোর সুযোগ পায় নি, কিন্তু নাজি দলে হিটলারের দখলদারি এবং পরে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই নাজি নেতারা বিদেশের মাটিতে প্রচারের গুরুত্ব বুঝত বলেই ১৯৩৩এই বিদেশ দপ্তরের কৃষ্টি বিভাগের নাম হয় কৃষ্টি রাজনীতি দপ্তর Kulturpolitische Abteilung। ওয়েমার আমলে কৃষ্টি রাজনীতি প্রকল্প শুরু হয়। বেশ কিছু সংগঠন নাজি দল আর রাষ্ট্রের বৈধতা অর্জন এবং সম্পদের ভাগ পেতে দল রাষ্ট্রের সঙ্গে এই কৃষ্টি প্রকল্প সম্পাদনে এগিয়ে আসে।

১৯৩৩এর পরে বহু নাজি এবং নাজি প্রভাবিত সংগঠন একযোগে বিদেশে কৃষ্টি রাজনীতি প্রকল্প প্রচারে সক্রিয় হয়েছে। নতুন 'রাইখ' প্রতিষ্ঠা, তার ঐশ্বর্য নির্মান করে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর মনে তৈরি হওয়া ভয়ের ধারণা পাল্টানোর জন্যে বন্ধুত্বের বার্তা দিতে শুরু করল জার্মান প্রভাবিত সঙ্গঠনগুলো।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯এর মধ্যে তৎকালীন উপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম সংগঠনের সঙ্গে জোট তৈরি করে জার্মান কৃষ্টি রাজনীতির প্রচার চালায়। এই পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন বৈজয়ন্তী রায় Hakenkreuz, Swastika and Crescent: The Religious Factor in Nazi Cultural Politics Regarding India প্রবন্ধে। একই সঙ্গে আমরা ব্যবহার করব ইউজিন ডিসুজার 'নাজি প্রোপাগান্ডা

ইন ইন্ডিয়া' প্রবন্ধ এবং দেখব তাদের স্বার্থ প্রচারে হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধ ধর্ম রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ব্যবহারের তরিকা।

ভারতবর্ষে নাজি নেটওয়ার্ক

১৯৩৩এর পর উপনিবেশিক ভারতবর্ষে মাকড়সা জালের মত ছড়িয়ে যায় নাজি প্রচার জাল মূলত জার্মান ব্যবসায়িক সংগঠন, জার্মান রাজদূতাবাস এবং বহু ব্যক্তি জার্মান এবং ভারতবর্ষীয় মধ্যস্থর মাধ্যমে। জার্মান ব্যবসায়িক সঙ্গঠন উনবিংশ শতক থেকে উপনিবেশিক ভারতে ব্যবসা করছিল। ১৯১৪র পরে ১৯২৫ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো কাজ বন্ধ করে। যুদ্ধের সময় এবং পরের সময়ে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের নেতারা জার্মানি ভিত্তি করে ব্রিটিশ বিরোধী যে সব বিপুল চালিয়েছিল, সে সবের দিকে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। তাদের আশংকা ছিল যুদ্ধোত্তর সময়ে এই প্রচারের প্রভাব বাড়বে।

জার্মানি ১৯২২এ ভারতবর্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বছরই কলকাতা, বম্বে আর মাদ্রাজে জার্মান দূতাবাস প্রতিষ্ঠা। রাজদূতদের প্রাথমিক কাজ হল ছিঁড়ে যাওয়া ব্যবসায়ি সম্পর্ককে আবার নতুন করে জোড়া দেওয়া। কূটনৈতিক দপ্তর খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা জার্মান কোম্পানি উপনিবেশে কাজ করার আগ্রহ দেখায়, এই কোম্পানিগুলো প্রতিষ্ঠা করেন নাজি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা। Stützpunkt, শুরু হয় ১৯৩২এ। বম্বেতে হেডকোয়ার্টার এবং ভিন্ন ভিন্ন শহরে শাখা স্থাপিত হয়। এইরকম একটি সংগঠন ডাচ কোম্পানির ঘোমটাওয়ালা Havero। হাভেরো হল জার্মান কর্পোরেট IG Farbenএর অন্তর্ভূক্ত সংগঠন। হেড আপিস স্থাপিত হল বম্বে। শাখা খোলা হল বিভিন্ন শহরে। নাজি পার্টি আর রাষ্ট্রের Gleichschaltung বা synchronizationএর পর বৈদেশিক দফতরে নাজি দলের সদস্যরাই কাজ করতে শুরু করে। নাজি দল আর রাষ্ট্রের আশা ছিল অধিকাংশ প্রবাসী জার্মানও একইভাবে রাষ্ট্র আর দলের স্বার্থরক্ষায় প্রণোদিত হবে। নাজি দলের সদস্যরা শুধু যে বিদেশে প্রচারই চালাত না, তারা স্পাইগিরিও করত একই সঙ্গে।

নাজিদের কৃষ্টি প্রচার

ডয়েশ একাডেমির ডিএ ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট

১৯২০র দশকে মিউনিখে আপাত অরাজনৈতিক সংগঠন ডয়েশ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে নাজি প্রচার চলত। ১৯২৫এ বিভিন্ন দেশে ডয়েশ একাডেমি ডিএ'র কমিটি তৈরি হয় Länderausschüsse। ১৯২৮এ প্রথম কমিটি Indischer Ausschuss বা ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট তৈরি হয় মিউনিখ ইউনিভার্সিটির ভূগোলের অধ্যাপক তারক নাথ দাসের আগ্রহে। তারক নাথ দাস ছিলেন ভারতবর্ষের

জঙ্গী আন্দোলনের অন্যতম হোতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বার্লিনে ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি গড়ে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালাতেন। হিটলার আর হেসের রাজনৈতিক শিক্ষক হাউসোফার জার্মানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলেন।

ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার তুঙ্গে তোলে। হাউসোফারের প্রভাবে জার্মান বিদেশমন্ত্রক ব্রিটিশ বিরোধী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলেকজান্ডার হামবোল্ট ফাউন্ডেশনেরে মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের জলপানি দিয়ে বিভিন্ন জার্মান সংগঠনে পড়ানোর উদ্যম নেয়, যাতে ফিরে দেশে প্রচার শুরু করে। আমরা দেখেছি কীভাবে ডিএ বিনয় কুমার সরকারের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রখ্যাতদের সম্মান জানানোর রেওয়াজ শুরু করে। তারা বাছত অভিজাত, উচ্চবর্ণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রখ্যাতদের। ডিএ নতুন দেশে বিপুল অর্থ খরচ করত Selbstgleichschaltungএর (voluntary synchronization with Nazi politics) উদ্দেশ্যে।

ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউটের অন্যতম উদ্দেশ্য হল জার্মানি জুড়ে বিপুল জাতিবাদের উত্থানের ফলে জার্মানিতে বসবাসকারী ভারতবর্ষীয়দের জীবন জীবিকা সমস্যায় পড়ছে, সে বিষয়ে জার্মানদের পক্ষে সাফাই গাওয়া। শাসক আর শাসক অভিজাতরা জার্মানির প্রবাসী ভারতবর্ষীয়দের পছন্দ করত না, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তাদের সমর্থন ছিল না। হিটলার শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণমুগ্ধই ছিলেন না, তিনি রুশ সাম্রাজ্যের অনেক চরিত্র আত্মস্থ করতে চাইতেন। ফলে হিটলার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধীদের উপহাস করতেন। হিটলার এবং নাজি তাত্ত্বিক রোজেনবার্গের বক্তব্য ছিল বর্তমান কালো চামড়ার ভারতবর্ষীয়রা অতীতের সাদা চামড়ার বিশুদ্ধ রক্তের আর্যদের সঙ্গে রক্ত সংকরের ফলেই জন্ম হয়েছে। তারা পতিত জাতি। নাজি নেতাদের নিয়মিত বিষোদ্গার এবং জার্মান সংবাদ মাধ্যমের কালো চামড়া বিরোধী প্রচারে জনগণের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। মাঝেমধ্যে আক্রমণও নেমে আসত, সে সব সংবাদ ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত এবং ভারতবর্ষে নাজি দল আর নাজি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ মনোভাব তৈরি হচ্ছিল। ভারতজুড়ে জার্মান বিরোধী মনোভাব দূর করতে জার্মানস্থিত ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট বিভিন্ন ধর্ম সংগঠনের সঙ্গে কাজ শুরু করে।

নাজিবাদ, হিন্দু পুনরুত্থানবাদ এবং আর্যত্ব

নাজি জার্মানির ক্ষমতাবানেরা জানতেন উচ্চবর্ণের ভারতবর্ষীয়দের কাছে আর্যত্ব গ্রহণযোগ্য ধারণা; তারা মনে করত আর্যরা তাদের পূর্বজ। জার্মান ভারতত্ত্ববিদের পাশাপাশি ম্যাক্সমুলারের পিঠচাপড়ানি আর হিন্দুপ্রাধান্যবাদী সংগঠনের প্রচারে ততদিনে আর্যতত্ত্ব সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। অনেকেরই ধারণা গৌরবজ্জ্বল

বৈদিক সমাজ আর্যদেরই নির্মান। এই ধারণাকে পুষ্টি দিয়েছেন ডিএর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তারকনাথ দাস। তাঁর পরিকল্পনায় রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের অনুগামী এবং বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নাজি জার্মানির যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তারকনাথ দাস নিয়মিত রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারতে লিখেছেন। ১৯৩৩এর পরে ডিএ আর্যতত্ব নির্ভর বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে নাজি জার্মানির যোগাযোগ এবং নাজি নীতি, তাত্ত্বিকতা প্রচার আর যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

গৌড়িয় মঠ

পূর্বাশ্রমে নরেন্দ্র নাথ মুখার্জী সন্ন্যাসাশ্রমে ভক্তি হৃদয় বনকে ১৯৩৪এ মিউনিখে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায় ডিএর ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট। ইন্সটিটিউট প্রধান কার্ল হাউসোফার ব্যক্তিগতভাবে ভক্তি হৃদয় বনকে মিউনিখে আমন্ত্রণ জানান। পশ্চিমের জনগণের সামনে তিনি আর্য, আধুনিক ভারতবর্ষ নিয়ে দ্য আর্য পাথ টু গড শীর্ষক বক্তৃতা দেন। বার্লিন ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটা শহরে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। প্রত্যেকটি বৈঠকে তিনি এডলফ হিটলারের নতুন জার্মানির শুধু প্রশংসাই করেন নি, তিনি বলেছেন 'ইওরোপিয়দের মধ্যে ইন্দো-আর্য ধর্ম একমাত্র বোঝে জার্মান জাতি'।

নাজি রাজনীতিকেরা ভক্তি হৃদয় বনের বাড়তে থাকা প্রভাবকে খুব একটা ভাল চোখে দেখছিল না। তিনি বলছিলেন প্রত্যেক মানুষ কৃষ্ণের সন্তান। 'থার্ড রাইখ'এর জার্মান নাজি দল এই বার্তায় ফুয়োরারের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে বলে মনে করছিল। সবে ক্ষমতায় আসা নাজি দল তখনও ভারত সম্পর্কে নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করে উঠতে পারেনি।

এই জার্মান যাত্রায় ভক্তি হৃদয় বনের সঙ্গে জনৈক আর্নস্ট জর্জ শুলজ নামে জার্মান ভক্ত জুড়ে যান। শুলজ ছিলেন নাজি সদস্য। শুলজ, ভক্তি হৃদয় বনের সঙ্গে ১৯৩৫এ কলকাতায় আসেন। নাম হয় সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ প্রথম থেকেই শুলজ ওরফে সদানন্দ দাসকে সন্দেহ করত। গৌড়িয় মঠের কাজে তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরতে থাকেন এবং ইংরেজি জানা ভারতবর্ষীয়দের কাছে কৃষ্ণ কথা প্রচার করতেন। পুলিশের ধারণা ছিল শুলজের সঙ্গে নাজি দলের এবং ভারতের জার্মান দূতাবাসের সরাসরি সম্বন্ধ আছে।

১৯৩৯এ শুলজের নামে আসা একটি ডাক থলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের হাতে আসে। প্যাকেটে ছিল Völkischer Beobachter, জাতীয় পর্যবেক্ষক পত্রিকা এবং Frankfurter Zeitung বা ফ্রাঙ্কফুর্টের সংবাদপত্রের কয়েকটা পাতা। এছাড়াও হিটলারের বক্তৃতা এবং নাজি প্রচার পত্র। থলে এসেছিল লক্ষনৌএর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা এমিলি দুবের নামে। এমিলি, শুলজকে চিঠিতে জানান তিনি জার্মানি যেতে চান হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে, শুলজ যেন তাঁকে সাহায্য করেন। আসা-যাওয়ার

খরচ তাঁর। ১৯৩৯এর ২৬ আগস্ট গোয়েন্দারা শুলজকে গ্রেফতার করে বেশ কিছু জার্মান মুদ্রা উদ্ধার করে। প্রথমের দিকে নিজেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দাবি করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি জানান নাজি দলের হয়ে তিনি গোয়েন্দাগিরি করতে ভারতবর্ষে এসেছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু জার্মান গুপ্তচরের হদিশ পাওয়া যায়, যার অন্যতম হল Horst Pohle আর Alfred Würfel – এরা দুজন কলকাতা আর বেনারসে জার্মান ভাষা শেখাতেন। দুজনের ওপরেই পুলিশ নজরদারি করত। শুলজ স্বীকার করেন, তার নামে নাজি দল প্রকাশিত Der Deutsche in Indien পত্রিকা ভারতবর্ষে আসত। জার্মান বীমা কোম্পানি এলায়েঞ্জ আর স্টুটগার্টারের দুই কর্মচারী দিল্লির গৌড়িয় মিশন মন্দিরে আসত। তারা ভারতবর্ষের বহু নাজি কাজকর্মের অর্থ জোগানদার ছিল। শুলজ জানান কলকাতার জার্মান উপরাজদূত Eduard von Selzam ১৯৩৫এর কলকাতার গৌড়িয় মঠে নাজি পক্ষীয় বক্তৃতা আয়োজনে সাহায্য করেছেন। গৌড়িয় মিশনের বহু মন্দির নাজি গুপ্তচরদের যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল।

গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল শুলজের অন্যতম উৎসাহ ছিল হিন্দু মহাসভা বিষয়ে খবর জোগাড় করার। শুলজের সঙ্গে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের যোগাযোগ ছিল। সাভারকর নাজিদের মতই আর্য রক্তের শুদ্ধতা এবং চাইতেন সব ভারতবর্ষীয়রই একই ধরণের শুদ্ধ ব্লাড লাইন থাকুক। তিনি মনে করতেন বিশুদ্ধ, অমিশ্রিত আর্য রক্তই পারে হিন্দু জাতিরাষ্ট্র তৈরি করতে।

আর্য সমাজি

দয়ানন্দ সরস্বতী বম্বেতে ১৮৭৫ আর লাহোরে ১৮৭৭এ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। নাজিদের মত আর্য সমাজিরাও মনে করত উপনিবেশের হিন্দুরা বৈদিক আর্যদের পতিত উত্তর প্রজন্ম। তারা হিন্দুদের সত্য বিশ্বাস, বৈদিক একেশ্বরবাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। জাতিবিদ্বেষগত আর্যতত্ত্বের বিশেষ করে সুপ্রজনবিদ্যার অন্যতম প্রবক্তা আর্য সমাজ। আর্য সমাজ বিশ্বাস করে বিশুদ্ধ আর্য রক্ত নির্ভর শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের। এই অবস্থান নাজি রাজনীতিরও। তাই আর্য সমাজিরাও নাজি প্রচার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়েছে। আর্য সমাজের বড় তাত্ত্বিক অবস্থান দেশভক্তি। ভদ্রবিত্ত এবং উচ্চবিত্তর জীবনে দেশভক্তি, রাষ্ট্রভক্তির বড় ভূমিকা আছে তাই আর্য সমাজ মন্ডলে বিপুল সংখ্যক ভদ্রবিত্তের সমাহার ঘটেছে। এইসব তত্ত্ব শিশু বয়স থেকেই ভদ্রবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে আর্য সমাজিরা 'দয়ানন্দ এংলো ভেদিক' ইস্কুল কলেজ তৈরি করেছে। এই ইস্কুল আর কলেজগুলো নতুন প্রজন্মকে মানসিকভাবে 'আধুনিক' বিশুদ্ধ রক্তের ইওরোপিয় হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেয়।

উপনিবেশিক শাসকেরা আর্য সমাজের কাজকর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল বলেই তাদের ওপর গভীরভাবে নজরদারি চালিয়েছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জানতে পারে

আর্য সমাজ নাজি তত্ত্বকে সমর্থন দিয়েছে। ১৯৩৫এর ২০ আগস্ট, সঙ্ঘের প্রচারক সত্যদেব, কুমায়ুন হিমালয়ে বলেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পতিত জার্মানিকে উদ্ধার করতে আবির্ভূত হয়েছেন ফুয়েরার। ১৯৩৫এর নভেম্বর সংগঠনের যামিনী মেহতা আর ব্রহ্মানন্দ'র দাবি ছিল জার্মানেরা আর্য ব্রাহ্মণ, ওম চিহ্ন তাদের পরিধেয়তে লাঞ্ছিত। হয়ত হাকেনক্রুজকে তারা ওম চিহ্ন ভেবেছেন। মেহতাও সুপ্রজনবিদ্যার প্রচারক। যুদ্ধের আগেই আর্য সমাজের মুখপত্র, মিলাপ, নাজি তত্ত্ব প্রচার করেছে। ১৯৩৯এ সাংঠনিকভাবে জার্মানির মত বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার দাবি জানানো হয়।

১৯৩৯এর মার্চে সত্যদেব নাজি জার্মানিতে যান। তিনি বিদেশদপ্তরকে অনুরোধ করেন ভারতে নাজি জাতি (বিদ্বেষ)তত্ত্ব প্রচারের জন্যে নাজি প্রচারপত্র দেওয়া হোক। তাকে আর্য ধর্ম নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। বার্লিন ইউনিভার্সিটির ভারতত্ত্বের অধ্যাপক বার্নহার্ড ব্রেওলারকে সত্যদেবের বক্তৃতা সিরিজ আয়জন করেন। গৌড়িয় মঠের সঙ্গে জার্মান নাজি দলের যে সঙ্ঘাত বেধে ছিল, সেই সঙ্ঘাতের যুগ নাজি জার্মানি অনেকটাই কাটিয়ে উঠে, রাজনৈতিক ধর্ম সঙ্গঠনগুলোকে নাজি প্রচারযন্ত্রের অংশ বানানোর উদ্যম নেয় এবং ভারতীয় ধর্ম সংগঠন সম্বন্ধে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। সত্যদেব ১৯৩৯এর জানুয়ারিতে ভারতবর্ষে ফিরে এসে হিন্দু মহাসভার বৈঠকে হিন্দু মহাসভার নীতির থেকে বেশি আলোচনা করেন হিটলার আর নতুন জার্মানির। ১৯৪০ পর্যন্ত তিনি নাজি দলের প্রতি অনুগত্য দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন ১৯৩৯এ মহাত্মা গান্ধীর পুত্র হিরালাল গান্ধী বিহারে আর্য সমাজের ৪, ৫ নভেম্বরের সম্মেলনে দাবি করেন আর্য সমাজের প্রতি হিটলারের সমর্থন রয়েছে।

জার্মানিতে নাজি নিয়ন্ত্রিত ডিএ আর্য সমাজকে নানাভাবে প্রচার দিয়েছে। ১৯৩৯এ মিউনিখ ইউনিভার্সিটির আর্য কৃষ্টি ও ভাষা বিভাগের অধ্যাপক, ওয়ালথার উস্ট ডিএর প্রধান হন। তিনি এসএসের সদস্য আর হিমলারের ছদ্মবৈজ্ঞানিক গবেষণা সংগঠন SS-Ahnenerbe বা 'পিতৃপুরুষ গবেষণা' বিভাগের প্রধান। আর্য সমাজের দুই ছাত্র ধীরেন্দ্র কুমার মেহতা এবং আর্যেন্দ্র শর্মাকে ডিএ আর হামবোল্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ জলপানি দিয়ে তার ইউনিভার্সিটিতে ভাষা তত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করেন। ধীরেন্দ্র কুমার মেহতা ছিলেন আর্য সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুকুলের ছাত্র। তিনি ১৯৪০এ বৈদিক অভিধান বিষয়ে তাঁর গবেষণা শেষ করেন। ডিএর পত্রিকায় 'আর্য সমাজ এবং তার প্রতিষ্ঠাতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

ওয়ালথার উস্ট ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউটের সঙ্গে এসএস আর Ahnenerbeর যোগসূত্র তৈরি করার উদ্যম নেন। ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের জন্যে তিনি 'ভারতবর্ষীয় চিহ্ন আর প্রতীক - অর্থ, বিকাশ আর জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজন করেন। ১৯৩৮এ ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউটের

এক বৈঠকে দাবি করেন এই বিষয় তারা বেছেছেন ভারতবর্ষীয়দের শেকড়ে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ১৯৩৯এর মার্চে ভারতবর্ষীয় পত্রিকাগুলোয় আরও খোলাখুলি নাজিবাদের প্রতি প্রচারের উদ্দেশ্যে, 'স্বস্তিকার আর্য উৎস এবং ভারতবর্ষ আর জার্মানে সাধারণ ব্যবহার' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। কলকাতার জার্মান দূতাবাসের পক্ষে আর্য সমাজের আর্যতত্ত্বে বিশ্বাসী ছাত্রের জার্মানি যাওয়ার জন্যে জলপানির আহ্বান জানানো হয় কলকাতার জার্মান ভাষা শিক্ষক Horst Pohle জার্মান দূতাবাস আর আর্য সমাজের মধ্যে সংযোগকারী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক এস এন মুখার্জী ২৫ আগস্ট ১৯৩৮এ ডিএকে চিঠি লিখে আর্য সমাজ অনুগামী ছাত্র অনিল ভূষণ নন্দী মজুমদারকে জলপানি প্রাপক হিসেবে বেছে নেওয়ার অনুরোধ জানান। এই চিঠিতে আর্য সমাজএর সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মী প্রসাদের একটি শংসাপত্র জুড়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৯এর অক্টোবরে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট আর্য সমাজের সম্পাদক বিদ্যানন্দ বেদালঙ্কার জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে Horst Pohleএর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি ছাত্র, যুব সংঠনের মধ্যে আরও বেশি করে নাজি তত্ত্ব প্রচারের উদ্যম নেওয়ার সংকল্প করেন।

হিন্দু মহাসভা

জার্মান নাজিরা, ভারতবর্ষে নাজিবাদ প্রচারে হিন্দু মহাসভার থেকে অনেক বেশি আর্য সমাজকে পছন্দ করত অনেকটা নামের জন্যে, সংগঠিত কাঠামোর জন্যে আর তাত্ত্বিক অবস্থানের জন্যে। নাজি প্রচারবিদ G.L. Leszczynski সাভারকরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন হিন্দুদের কাছে নাজি নীতি পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে। বহু পরে থার্ড রাইখের কর্তারা হিন্দু মহাসভাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। Leszczynski হিটলারের কাছে রুজভেল্ট নিয়ে সাভারকারের একটি নোট পাঠান। ১৯৩৮এর ৩০ নভেম্বর Völkischer Beobachter পত্রিকায় সাভারকারের বক্তৃতা ছাপে।

নাজিদের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার যোগ শুধু সাভারকর ছিলেন না, গোয়েন্দারা Leszczynskiকে গ্রেফতার করলে তার কাছে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ইন্দ্র প্রকাশের লেখা চিঠি উদ্ধার হয়। সেই চিঠিতে দুটি সঙ্গঠনের যৌথ স্বার্থে আরও গভীরভাবে কাজ করার কথা বলা হয়েছিল। ইন্দ্র প্রকাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত ডেইলি হিন্দু আর হিন্দু আউটলুকে তিনি Leszczynskiকে আরও বেশি নাজি প্রচারপত্র পাঠাবার অনুরোধ জানান। ১৯৩৯এর মার্চে হিন্দু মহাসভার সম্মানিত সম্পাদক পদ্মরাজ জৈন জার্মানির উত্থানে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দূতাবাসকে চিঠি লেখেন।

বৌদ্ধ

বৌদ্ধরা ভারতবর্ষের থেকে শ্রীলঙ্কা আর বার্মায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেখানে জার্মানদের সংখ্যা কম ছিল। শিল্পী Ernst Lothar Hoffmann, পরে বৌদ্ধ অনাগরিক গোবিন্দর মার্ফত বৌদ্ধপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে নাজি দল। অনাগরিক গোবিন্দ, আর্য মৈত্রেয় মণ্ডল স্থাপন করেন ১৯৩৩এ। ১৯৩১এ তিনি বিশ্বভারতীতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি বৌদ্ধপন্থ আর ইওরোপিয় ভাষা শিক্ষা দিতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় যান। বৌদ্ধ শিক্ষক জার্মান এন্টন গুথ ওরফে নয়নতিলককে চিঠি লিখে জানান এই ভ্রমণে তিনি সারনাথে বৌদ্ধ ইউনিভার্সিটি তৈরি করার জন্যে অনেকগুলো বক্তৃতা দিলেও প্রয়োজনীয় অর্থ ওঠে নি। বেনারসে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী ভিক্ষু স্বরণঙ্করের সঙ্গে দেখা করেন। স্বরণঙ্কর বাংলায় হিংসা ছড়ানোর দায়ে বহিষ্কৃত হন। অনাগরিক গোবিন্দ লখনৌতে জাতীয় কংগ্রেসের কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। গোয়েন্দাদের ধারণা ছিল বিশ্বভারতীতে পড়াবার সময় থেকেই নেহরু আর কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। গোয়েন্দাদের অভিযোগ তিনি বর্মি জাতীয়তাবাদী ওখটামার ওরফে উত্তমার জার্মান ভ্রমনের জন্যে পাসপোর্ট তৈরি করে দেওয়ার প্রভূত চেষ্টা করেছেন। উত্তমা বহুবার জেল খেটেছেন। ১৯৩৫এ উত্তমা কানপুরে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সাভারকর মনে করতেন সব বৌদ্ধই হিন্দু, কিন্তু বৌদ্ধরা পতিত হিন্দু, তাদের মনের জোর নেই বলে অহিংসা প্রচার করে।

শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধরা হিন্দুমহাসভার মতই আর্যত্বে বিশ্বাস করত। শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধরা মনে করত বুদ্ধ স্বয়ং উচ্চশ্রেণীর আর্য, ইওরোপিয়রা বিশেষ করে ব্রিটিশরা ম্লেচ্ছ। শ্রীলঙ্কায় আর্যত্ব নির্ভর করে বৌদ্ধ আর হিন্দুমহাসভা এক যোগে কাজ করতে শুরু করে। দুই সংগঠন নির্ভর করে নাজিরা প্রচার চালাত। অনেক চেষ্টা করেও অনাগরিক গোবিন্দ, উত্তমার পাসপোর্ট তৈরি করতে ব্যর্থ হন।

অনাগরিক গোবিন্দ'র সারনাথে প্রস্তাবিত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিএর Horst Pohle আর Franz Thierfelder সক্রিয় হয়। Thierfelder ছিলেন ডিএর সেক্রেটারি। অনাগরিক গোবিন্দ, Pohleএর যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে ড্রেসডেনের জার্মান ব্যাঙ্ক থেকে ১০ হাজার রাইখসমার্ক জোগাড়ের চেষ্টা করেন। Pohleকে অনাগরিক গোবিন্দ জানালেন ১০ হাজার মুদ্রা পেলে, ৫ হাজার ডিএর জন্যে বরাদ্দ করবেন। জার্মান কনসাল জেনারেল Pohleকে এ বিষয়ে উদ্যমী হয়ে ব্যাঙ্ককে চিঠি লিখতে বলেন। যুদ্ধের আগে অনাগরিক গোবিন্দ বেশ কিছু আর্থিক সাহায্য জোগাড় করেছিলেন।

যদিও অনাগরিক গোবিন্দ ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের জানিয়েছিলেন তিনি নাজিদের অপছন্দ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ রিপোর্টে বলা হল 'অনাগরিক গোবিন্দ দুই নাজি

অপারেটর Pohle আর Würfelএর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কাজ করে। এরা দুজন যদি নাজি হয়, তাহলে অনাগরিক কেন নাজি নয়?' আজ একটা বিষয় পরিষ্কার হফম্যান ওরফে অনাগরিক গোবিন্দ নাজি প্রচার যন্ত্রের অন্যতম নাটবল্টু হিসেবে কাজ করেছেন।

অনাগরিক গোবিন্দ ১৯৩৯এ দিল্লিতে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী আয়োজন করেন। সহয়ায়ক ছিলেন জনৈক শ্রীমতী সিদ্দিকি। শ্রীমতী সিদ্দিকির সঙ্গে দুই নাজি অপারেটর Leszczynski আর Sommerএর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। শ্রীমতী সিদ্দিকির স্বামী আবদুর রহমান সিদ্দিকি - অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীমতী সিদ্দিকিও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের কর্ম সমিতির সদস্য ছিলেন। আবদুর রহমান সিদ্দিকির সঙ্গে ডিএর Horst Pohleএর যোগাযোগ ছিল। মাথায় রাখতে হবে অনাগরিক গোবিন্দ স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশ নাগরিক হলেও জার্মান নাগরিকত্ব ছাড়ে নি।

মুসলমান জাতীয়তাবাদ

হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের পাশাপাশি নাজিরা মুসলমান জাতীয়তাবাদিদের মাধ্যমে নাজি নীতি প্রচার করেছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের ধারনা ছিল কংগ্রেসের তুলনায় মুসলমান সমাজ অনেক বেশি গভীরভাবে নাজি তত্ত্বের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। পাকিস্তান আন্দোলনের দাবিতে একটা সময় নাজিদের খোলাখুলি সমর্থনের জন্যে মুসলমান সমাজের একাংশ নাজিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে।

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে জার্মান সোসাইটি

আমরা দেখেছি, ১৯৩৩এ কলকাতায় বিনয় সরকারের বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে জার্মান সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামিক পণ্ডিত Otto Spies, সাত্তার খেইরির সহায়তায় - ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের ভাষায় নাজি সেল। সাত্তার আর তার ভাই জব্বার বহুকাল ইওরোপ বিশেষ করে জার্মানিতে ভারতে মুসলিম রাষ্ট্র তৈরির স্বপ্ন প্রচার করেছেন। বন ইউনিভার্সিটি Otto Spiesকে ভারতে জার্মান সোসাইটি তৈরি করার কাজ করার জন্যে ছুটি দেয়। সোসাইটির উদ্দেশ্য নতুন জার্মানির শৌর্য প্রচার এবং নাজিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করা। Otto Spies জানান জার্মান জাতি পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক। খেইরি ভায়েরা ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারের জন্যে ১৯৪০এ গ্রেফতার হন। এরপরেই জার্মান সোসাইটি বন্ধ হয়ে যায়।

আগেই অন্য প্রবন্ধে বলেছি, ১৯৩০এর দশকে দ্য স্টেটসম্যানের প্রতিবেদনে খেইরি ভাইদের নাজি প্রচারের অন্যতম মুখ বলা হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে, জার্মানির এসএসের নকলে ব্রাউনশার্ট আন্দোলনের জনক তারা। শুধু জার্মান সোসাইটিই নয়,

খেইরি যেহেতু অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি এই সঙ্গঠনকে জার্মানদের স্বার্থেও কিছুটা কাজে লাগিয়েছেন। ১৯৩৯এ বাবর মির্জা 'আধুনিক জার্মানি থেকে ভারত কি শিখতে পারে' শীর্ষকে বক্তৃতা দেন। ইউনিভার্সিটি এই বক্তৃতাটি ছাপায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট খেইরি ভায়েরা কলকাতার জার্মান দূতাবাস থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছে।

জার্মান সোসাইটির অন্যতম সদস্য নিয়াজ আহমেদ খান ১৯৩৩এ ডিএর Franz Thierfelderএর সাহায্যে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখ থেকেও প্রযুক্তিবিদ্যায় গবেষণা শেষ করেন। Thierfelder বম্বের জার্মান উপরাজদূত Karl Kappকে লেখেন নিয়াজ আহমেদ খানকে সাহায্য করার জন্যে, কারন নিয়াজ ডিএ আর ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে। গোয়েন্দাদের ভাষায় নিয়াজ ছিল নাজিপক্ষীয় প্রচারক। অর্থ সাহায্য ছাড়াও ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারের জন্যে খেইরিকে জার্মান রাজদূত কলকাতা থেকে প্রচুর পরিমান বই পাঠিয়েছে।

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর
আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা -

যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস

গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী

বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা

গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা

কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।

সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি

প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা

এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।

ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে

জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

জ্ঞানগঞ্জ ।। ঔপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা আয়োজিত

আয়োজিত চার পর্বের আলোচনাসভার প্রথম পর্ব

।। ১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা লুঠ গবেষণা আন্দোলন।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ।। গ্রন্থাগার ।।

‘দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে’ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া (১৭৫৭-১৭৯০)

২, ৩, ৪, মে ২০২৪
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ১১ টা থেকে
অনিতা ব্যানার্জি মেমোরিয়াল হল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা সভা

প্রদর্শনী (বইপত্র, দেশি প্রথার চাষ করা নিরাপদ খাবার, কারিগরি দ্রব্য, নৌকো প্রদর্শনী), খন পালাগান, গমীরা মুখা নাচ, ছাত্র, হকার চাষী কারিগর শ্রমিক অন্য পেশাদারদের গোলটেবিল বৈঠক

কলাবতী মুদ্রা ।। বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সংঘ ।। আর্ট এগেন্সট অপ্রেশন ।। পাঞ্জেরি আর্টিস্টস ইউনিয়ন ।। পরম পত্রিকা ।। অপ্রচলিত পত্রিকা ।। অক্ষরযাত্রা প্রকাশন ।। টানাপোড়েন পত্রিকা।।